আয়ুবের সঙ্গে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীমন্মথ নাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী

সুধীর মৈত্র

দুই টাকা

শ্রীপ্রতাপকুমার রায়

বন্ধুবরেষু

এই গ্রন্থের রচনাকাল ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০। পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে তারপর আরও কিছু-কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রন্থপাঠের সময় রচনাকালের কথাটা, সুতরাং, মনে রাখা দরকার

খবরটা এক বিদেশী কাগজে বেরিয়েছিল। অনেকেই হয়ত দেখে থাকবেন। পাকিস্তানে তখন গণতন্ত্রের অবসান ঘটেছে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দর মির্জা তখনও বিদায় নেননি। মির্জা ভেবেছিলেন, বিদায় তিনি নেবেন না। কেন নেবেন? আয়ুব মিলিটারী মানুষ। তিনিও মিলিটারী। অফিসারদের মধ্যে আয়ুবের কিছু সমর্থক আছে। তাঁরও আছে। আয়ুব স্যাণ্ডহার্স্ট-ট্রেণ্ড। তিনি নিজেও তা-ই। আর তা ছাড়া, ঠিক আয়ুবের মতই, তিনিও কোনওদিন 'অশিক্ষিতের গণতন্ত্রে' বিশেষ আস্থা রাখেননি। সুতরাং, গণতন্ত্র চুলোয় যাক, আয়ুবকে সামলানো তাঁর পক্ষে কঠিন হবে না। বিদেশী ক্যামেরাম্যানদের সামনে বসে, আয়ুবের সঙ্গে চা খেতে খেতে, হয়ত এইসব কথাই তিনি ভাবছিলেন। ভাবছিলেন আর লক্ষ্য করছিলেন যে, ফ্লাড-লাইটের সামনে যেন আয়ুব ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করছেন। ঠাট্টা করে আয়ুবকে তিনি বলেছিলেন, "এ-সব ব্যাপারে এখনও তুমি ধাতস্থ হওনি দেখছি। কী জানো, রাজনীতিই যদি করতে হয়, কড়া আলোয় কাহিল হলে চলবে না। অভিনেতাদের ত দেখেছ, সারাক্ষণ তাদের ফ্লাড-লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। তোমাকে অভিনেতা হতে হবে।"

মাত্র আড়াই ঘণ্টা পরের কথা। ফটো তুলিয়ে, আরও দু-চারটে লম্বা-চওড়া কথা বলে, এবং আয়ুবের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে প্রেসিডেণ্ট-ভবনে ফিরে গিয়ে মির্জা সেদিন দেখেছিলেন যে, সশস্ত্র তিনজন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সেখানে অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন তাঁরই জন্যে। মির্জা আসতেই তাঁকে তাঁরা ঘিরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তাঁদের আয়ুব খাঁর চিঠি। চিঠির মর্মার্থ অতি প্রাঞ্জল। আয়ুব

জানাচ্ছেন, মির্জাকে পদত্যাগ করতে হবে। অবিলম্বে। ব্যাপার দেখে মির্জার বিবি-সাহেবা সেদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। মির্জা অবশ্য জ্ঞান হারাননি। তবে তিনি বুঝেছিলেন যে, লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বড়ই অল্প। আয়ুব আসলে একজন দক্ষ অভিনেতা।

কতখানি দক্ষ? জানতে আমার আগ্রহ ছিল। পাকিস্তানের স্বয়ংবৃত প্রেসিডেন্ট (এই সেদিন পর্যন্তও তিনি স্বয়ংবৃতই ছিলেন) ফিল্ড-মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁর পূর্ববঙ্গ-সফর সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাই যখন আমাকে ঢাকায় পাঠানো হয়, আমি আপত্তি করিনি।

আয়ুব পূর্ববঙ্গে ছিলেন মোট ন দিন। এই ন দিনে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়নি। কিন্তু সাংবাদিকদের কলম, পেনসিল এবং টাইপ-রাইটার প্রায় সারাক্ষণই ব্যস্ত ছিল। এই ন দিনে ট্রেনে, প্লেনে, স্টীমারে, লঞ্চে, মোটরে তিনি প্রায় ষোল শ মাইল ঘুরেছেন। ঘুরেছি আমরাও। ভারতীয়, পাকিস্তানী, সিংহলী এবং শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকের দল। দশটি জেলায় তিনি গিয়েছেন। আমরাও গিয়েছি। তিনি ফিতে কেটেছেন। আমরা দেখেছি। তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। আমরা নোট নিয়েছি। তাঁকে প্রশ্ন করেছি। তিনি উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন এসেছে জনসাধারণের কাছ থেকেও। যৌথ প্রতিরক্ষা থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, হাজার রকমের প্রশ্ন। ইংরেজীতে, উর্দুতে, বাংলায়। তাঁরও উত্তর দিয়েছেন তিনি। কখনও হাসিমুখে, কখনও ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে। হাজার হাজার মানুষ তাঁকে দেখতে এসেছে। শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ, গঞ্জের মানুষ। নেকটাই-পরা অফিসার আর নেংটি-পরা চাষী-মানুষ। আয়ুব তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেই কথাগুলি কাগজে-কাগজে প্রকাশিত এবং তারে-বেতারে প্রচারিত হয়েছে। একমাত্র রেডিও-পাকিস্তানেরই সাতাশ-জন এঞ্জিনীয়ার এবং কুড়িজন ভাষ্যকার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। সতেরোটি ট্রান্সমিটারে তিন লক্ষাধিক শব্দ

প্রচারিত হয়েছে তাঁর সফর সম্পর্কে। আয়ুবের সঙ্গে ডানিয়ুবের মিল দিয়ে মফস্বলের এক কবি—নাকি পদ্যকার বলব?—একটি প্রশস্তি লিখে এনেছিল। সেটিও তিনি শুনেছেন। সেইসঙ্গে, যেখানেই তিনি গিয়েছেন, মুহুর্মুহু ঝলসে উঠেছে ক্যামেরাম্যানদের ফ্ল্যাশ-বাল্‌ব। কিন্তু উল্লেখ করা ভাল যে, আয়ুব তাতে এতটুকুও অস্বস্তি বোধ করেননি। জানি না, আজ থেকে তেরো মাস আগে যে-অস্বস্তি একদিন ইস্কান্দর মির্জার চোখে পড়েছিল, সেটা কাল্পনিক কিনা। কিংবা, এমনও বিচিত্র নয় যে, সেই অস্বস্তিও হয়ত আয়ুবের অভিনয়-কৌশলেরই একটা অঙ্গ। হয়ত তা-ই হবে। মির্জা তাই আজ লণ্ডনে গিয়ে হোটেল চালাচ্ছেন এবং আয়ুব তাই আজ পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতা।

কলকাতা থেকে ঢাকা। আকাশে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। শীতের সকাল। বিশ্ব-চরাচর যেন ঝলমল করছে। আই-এ-সির ডাকোটা যখন তেজগাঁওয়ে গিয়ে নামল, আমার ঘড়িতে তখনও নটা বাজেনি। কিন্তু ঢাকায় তখন সাড়ে নটা। এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস-অ্যাটাশে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত। আর ছিলেন পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি। কাস্টমসের বেড়ায় অতএব মাথা ঠুকে মরতে হয়নি। বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পুলিশ-অফিসার আমাদের পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "বিদেশীদের গতিবিধি এখানে নিয়ন্ত্রিত বটে, কিন্তু কোনও নিয়মই এ-ক্ষেত্রে খাটবে না। আপনারা আমাদের অতিথি। যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তাই প্রত্যাহার করা হয়েছে। যেখানে খুশি, আপনারা যেতে পারেন।

বলে কী? যেখানে খুশি যেতে পারি? পাকিস্তানে? বুঝলাম হাওয়া ঘুরেছে। কিন্তু কোথায় যাব?

প্রোটোকলের ভদ্রলোক বললেন, "যেখানে আপনাদের ইচ্ছে। আপাতত সার্কিট-হাউসে চলুন। কলকাতার সাংবাদিকরা সব সেইখানেই থাকবেন। বলেন ত শাবাগ হোটেলেও ব্যবস্থা করতে পারি।"

বললাম, "তা-ই করুন। সার্কিট-হাউসের কথা আমরা শুনেছি। অতি উত্তম জায়গা, কিন্তু, যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, এ বিট আউট অব দি ওয়ে। তার চাইতে বরং শাবাগই ভাল।"

শাবাগে পৌঁছে বুঝলাম, স্থান-নির্বাচনে আমাদের ভুল হয়নি। বস্তুত ঢাকার মতন শহরে যে এমন সর্বগুণান্বিত একটি হোটেল থাকতে পারে, এ আমার স্বপ্নেরও বহির্ভূত ছিল। শুধু আমার কেন, আমার

সঙ্গী অমিতাভেরও। ঝকঝকে তকতকে শা-মস্ত হোটেল। বাগান, ফোয়ারা, লাউঞ্জ, বার্, ডাইনিং হল, গ্রীল-রুম, অর্কেস্ট্রা ; সব মিলিয়ে যেন রম্‌রম্ করছে। ঘরে গিয়ে স্নান করে নিলাম। তারপর অমিতাভকে বললাম, "আয়ুবের প্লেন আসবে আড়াইটেয়। এয়ারপোর্টে যেতে হয় ত তুমিই যেয়ো। আমি এবারে ঘুমুবো।"

বললাম ত ঘুমুবো, কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্যি। আমাদের ঘরখানা একেবারে আয়ুব অ্যাভেন্যুর উপরে। মুহুর্মুহু সেই পথের দিক থেকে চিৎকার উঠছে। বারান্দায় গিয়ে দেখি, সারি সারি মানুষ চলেছে এয়ার্-পোর্টের দিকে। ছিন্নবস্ত্র শীর্ণকায় মানুষ। কিন্তু উৎসাহ তাদের অফুরন্ত। প্রত্যেকের হাতেই ছোট্ট একটি সবুজ পতাকা। মুখে স্লোগান।

"ফিল্ড-মার্শাল আয়ু—ব…"

"জিন্দাবাদ।"

"পাকিস্তা— ন…"

"জিন্দাবাদ।"

"নারা-এ-তকবী—র…"

"আল্লা হো আকবর।"

বুকটা যেন ধড়াস করে উঠল। ঈশ্বর মহান, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে, ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞাপনে মুখর ওই ধ্বনি শুনে আজও আতঙ্ক জেগে ওঠে। মনে পড়ে যায় ছেচল্লিশের কথা। ঈশ্বরের জয়ধ্বনি শুনে শিশুও যখন তার ঘুমের মধ্যেই কেঁপে উঠত, এবং বয়স্ক মানুষের চোখেও যখন ঘুম আসত না।

ঘুম আমারও এল না। পোশাক পালটে, নীচে নেমে, ঘরের চাবি হল্-পোর্টারের হাতে জমা দিয়ে, পাক-জমহুরিয়তের অফিসে গিয়ে উঠলাম। জমহুরিয়ত কথাটার মানে গণতন্ত্র। এ-বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করা যাবে। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, পাকিস্তানে

এখন নতুন ধরনের একটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। আয়ুব তার নাম দিয়েছেন "বেসিক ডিমোক্রেসি"। এই বেসিক ডিমোক্রেসি বা বুনিয়াদী গণতন্ত্রের সূত্র ধরেই আয়ুব পূর্ববঙ্গে এসেছেন এবং সেই উপলক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাক-জমহুরিয়তের এই অস্থায়ী অফিস।

জমহুরিয়তের অফিস একেবারে শাবাগ হোটেলের সামনেই। গিয়ে দেখি জোর মিটিং চলেছে। ঘরভর্তি সাংবাদিক। সফরসূচীর বিবরণ তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাক-প্রেসিডেণ্ট কবে কোথায় যাবেন; খবর পাঠাবার ব্যাপারে সাংবাদিকদের কী কী সুবিধে দেওয়া হবে; বেয়ারিং অথরিটি না-থাকলেও প্রেস-টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে কিনা; স্টীমারে, লঞ্চে, স্পেশ্যাল ট্রেনে খাবার, থাকবার, ঘুমোবার কী ব্যবস্থা হয়েছে; রেডিয়ো-টেলিফোনের সুবিধে কীভাবে পাওয়া যাবে, তারই সবিস্তার বর্ণনা। বর্ণনা দিচ্ছেন মিঃ কুরেশি। আগে ইনি সাংবাদিক ছিলেন; রয়টারের লণ্ডন অফিসেও বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন। এখন আছেন পাক-সরকারের চাকরিতে। হাসিখুশী মানুষটি। টেবিলের উপরে মস্ত একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়ে আসন্ন সফরের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন।

তাঁর বর্ণনা তখনও শেষ হয়নি। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, আয়ুব আর আজ আসছেন না। কথা ছিল, রাওয়লপিণ্ডি থেকে তিনি লাহোরে আসবেন; লাহোর থেকে ঢাকায়। সেই অনুযায়ী পিণ্ডি থেকে তিনি রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় লাহোরে নামা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। লাহোরের আকাশ থেকেই তাঁর ভাইকাউণ্ট প্লেন আবার পিণ্ডিতে ফিরে গিয়েছে। একবার নয়, দু বার। আয়ুব, সুতরাং, আজ আর আসবেন না। আগামী কাল, একুশে জানুয়ারি, তিনি আসবেন।

বাঁচা গেল। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ-দপ্তরের একটা গাড়ি চেয়ে নিয়ে আমরা শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমে ছিল কালো একটা বিন্দু। পশ্চিমাকাশের সেই বিন্দুটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। কানাকানি পড়ে গেল এয়ারপোর্টে। সিকিউরিটির লৌহবেষ্টনী আরও শক্ত হয়ে উঠল। এতক্ষণ যাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন এদিকে ওদিকে, ছোট-ছোট এক-একটা চক্র রচনা করে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলেন, মুহূর্তে যে-যাঁর আপন জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। অফিসাররা তাঁদের নেকটাইয়ের ফাঁসের উপরে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন; অফিসার-গৃহিণীরা তাঁদের চুলের উপরে। ডিপ্লোম্যাটরা তাঁদের টুপির ভঙ্গিমাটিকে আর-একটু দুরস্ত করে নিলেন; পুলিস-অফিসাররা তাঁদের বেল্টের বাঁধুনিকে। মনে-মনে হয়ত সম্ভাব্য সম্ভাষণের উচ্চারণটাকে আর-একবার ঝালিয়ে নিলেন সকলেই। এগুলি হল লাস্ট-মিনিট টাচ।

সাংবাদিকদের না আছে টুপি, না আছে বেল্ট, না আছে অন্য-কিছু। থাকবার মধ্যে আছে শুধু একটা পেনসিল। অগত্যা সেই পেনসিলটাকেই বাগিয়ে ধরে তাঁরা তৈরী হয়ে রইলেন। আয়ুব খাঁর প্লেন আসছে।

প্লেন এল। চার ইঞ্জিনের ভাইকাউন্ট। মস্ত বড় দুই ডানাকে দুদিকে প্রসারিত করে দিয়ে, এয়ারপোর্টের উপরে একটা চক্কর দিয়ে, নীচে নেমে এল। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিক। এতক্ষণ তিনি একটিও কথা বলেননি। এবারে বললেন। প্রপেলারের গর্জন বন্ধ হবার পর শুধু সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য করলেন। 'পারফেক্ট ল্যাণ্ডিং'।

তাঁর কথার আমি জবাব দিইনি। আমি শুধু দেখছিলাম,

ভাইকাউন্টের উন্মুক্ত দরজায় যিনি এসে দাঁড়ালেন, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে এলেন, তিনি যে এই উপমহাদেশেরই মানুষ, তা অন্তত তাঁর চেহারা থেকে বুঝবার উপায় নেই। টকটকে গৌর বর্ণের দেহশ্রী। সেই গৌর বর্ণের উপরে আবার একটি লালচে আভা ফেটে পড়ছে। চোখের তারা পিঙ্গল নয় বটে, তবে কালোও নয়। দৈর্ঘ্যে ছ ফুট কিংবা তারও কিছু বেশী। প্রস্থও অসামান্য। তবে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছে। দেখে, আর যা-ই হক, স্থূলাঙ্গ মনে হবে না। বড় জোর মনে হবে হেভিলি বিল্ট। মুখের হাসিটি যে তালিম দেওয়া, তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ, এই মুহূর্তে তাঁর ঠোঁট দুটি যদিও বিস্ফারিত, দৃষ্টিতে সেই হাসির কোনও স্পর্শ ঘটেনি। এবং ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত বলেই দেখা গেল যে, দাঁতের পাঁতিও পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ সংলগ্ন নয়। দাঁত দেখে যাঁরা চরিত্র-বিচারে অভ্যস্ত, তাঁদের কেউ উপস্থিত থাকলে হয়ত সিদ্ধান্ত করতেন, সেনশুয়ল। কথাটা সত্য হত কিনা, আমি জানিনে।

পরনে হাল্কা বাদামী রঙের টু-পিস স্যুট, ইসলামী রাষ্ট্রের ত্রাণকর্তা হিলাল-ই-জুরত হিলাল-ই-পাকিস্তান ফিল্ড-মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁ তাঁর প্লেন থেকে নেমে এলেন। ডিপ্লোম্যাট আর অফিসাররা সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলেন; একে একে তাঁদের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হল। তারপর সাংবাদিকদের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, "এনি কোয়েশ্চেন্‌স ?"

প্রশ্ন ছিল। সবচাইতে জরুরী প্রশ্ন, ভারত আর পাকিস্তানের জয়েণ্ট ডিফেন্স সম্পর্কে কী ভাবছেন তিনি? নেহরুজী জানিয়েছেন, নন্‌-অ্যালায়েনমেণ্টের অর্থাৎ শক্তিজোটে যোগ না-দেবার নীতিকে তিনি বর্জন করবেন না। তাহলে ?

আয়ুব তার বড় জবর উত্তর দিলেন। বললেন, "নন্‌-অ্যালায়েন-

মেণ্টের সঙ্গে ত জয়েণ্ট ডিফেন্স-প্রস্তাবের কোনও বিরোধ নেই ; আমরা রাশিয়াও নই, আমেরিকাও নই, রাশিয়া অথবা আমেরিকার সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতাও আমরা করছিনে। নন্-অ্যালায়েনমেণ্টের নীতিকে অনুসরণ করেও তাই যৌথ প্রতিরক্ষায় যোগ দেওয়া যেতে পারে।”

শুধু এইটুকু বলেই তিনি থামলেন না। আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে যা বললেন, যৌথ প্রতিরক্ষার একটা নতুন ব্যাখ্যা তাতে পাওয়া গেল। বললেন, “যৌথ প্রতিরক্ষা ত নানানভাবেই সম্ভব। ভারত আর পাকিস্তানের সৈন্যরা এখন পরস্পারের মুখোমুখী হয়ে আছে। আর কিছু না করে যদি এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থাটার অবসান ঘটানো যায়, এমন একটা অবস্থার যদি সৃষ্টি করতে পারি, ভারত-পাক সীমান্তে প্রহরানিরত না থেকে এই দুই দেশের সৈন্যরা যাতে অন্য সীমান্তে গিয়ে তাদের আপনাপন দেশরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত হতে পারে, তাতেও আমার আপত্তি নেই। সেও একরকমের যৌথ প্রতিরক্ষাই।”

অন্য সীমান্তে? কোন্ সীমান্তে? বলাই বাহুল্য, ব্রহ্ম অথবা আফগানিস্তানের সীমান্তে নয়। তাহলে? এলিমিনেশনের নিয়ম প্রয়োগের ফলে উত্তরটা এতই স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল যে, আয়ুবকে আর এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করবারই প্রয়োজন হল না।

একটা কথা বুঝতে পারছিলাম। যৌথ প্রতিরক্ষার প্রস্তাবে যেহেতু ভারতবর্ষের দিক থেকে কোনও উৎসাহ দেখানো হয়নি, আয়ুব তাতে যেন দৃশ্যতই ঈষৎ বিচলিত হয়েছেন।

আয়ুব বুঝতে পেরেছেন, তাঁর হিসেবে কোথাও ভুল হয়েছিল। হালে পানি পায়নি তাঁর যৌথ প্রতিরক্ষার প্রস্তাব। তিনি একটু বেশী রকমের এগিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আবার তাঁর ফিরে যাবার পালা। কিন্তু সেই ফেরাটা যেন সম্মানজনক হয়। লোকে যেন বুঝতে না পারে যে, তাঁর প্রস্তাবকে একেবারে আমল দেওয়া হয়নি। প্রস্তাবটা

যাতে পুনর্বিবেচিত হয়, তার জন্যে তাঁকে এখন নতুন রকমের একটা ব্যাখ্যা জুড়ে দিতে হবে। তেজগাঁও এয়ারপোর্টে সেই নতুন ব্যাখ্যাই তিনি দিয়েছেন। আয়ুবের মনের খবর আমি জানিনে। কিন্তু, তাঁর এই ব্যাখ্যা, আমার মনে হয়, একটা আফটারথট।

আসল প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যাছে। আয়ুবের এই সর্বাধুনিক ব্যাখ্যার পরেও কি সফল হবে তাঁর জয়েণ্ট ডিফেন্সের প্রস্তাব? যদি-বা হয়, তাকে কি জয়েণ্ট ডিফেন্স বলা যাবে? ভারত আর ব্রহ্মদেশের সৈন্যরা ত কোথাও পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধনেত্রে তাকিয়ে নেই। তার মানে কি এই যে, ভারত আর ব্রহ্মদেশ এখন জয়েণ্ট ডিফেন্সের গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছে? এ ছাড়া আর-একটা দিক থেকেও আয়ুবের কথাটাকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আয়ুব বলেছেন, দুই দেশের সৈন্যরা যাতে পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে, তার ব্যবস্থা হলেই তিনি খুশী। প্রশ্ন উঠবে, বর্ডার-সেট্‌ল্‌মেণ্টের পরেও কোথায় তারা মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে? বলা বাহুল্য কাশ্মীরে। ঘুরেফিরে, সুতরাং, সেই কাশ্মীরের প্রশ্নেই এসে পৌঁছতে হল। কিন্তু কাশ্মীর-সমস্যা-সমাধানের ত কোনও নতুন ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেননি। কাশ্মীর-প্রসঙ্গে ত এমন একটি কথাও তিনি বলতে পারেননি, ভারতের পক্ষে যা গ্রহণযোগ্য হয়। বরং পাকিস্তানী জনসাধারণের কাছে এখন আয়ুবকেও ত সেই পুরনো প্রতিশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। বলতে হচ্ছে, "কাশ্মীর আ যায়েগা। জরুর আ যায়েগা।" তাহলে?

হোটেলে ফিরে এসেই কলকাতার একটা ট্রাঙ্ক-কল বুক করেছিলাম। তারপর লাউঞ্জে বসে পরস্পরের সঙ্গে নোট্‌ মিলিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় হিন্দুস্থান টাইমস-এর কহ্লন বলল, "গ্যাখো, গ্যাখো, চেহারাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

চোখ তুলে যাঁকে দেখলাম, সত্যি বলতে কী, তাঁকে এখানে প্রত্যাশা করিনি। অবিভক্ত বাংলা দেশের শেষ প্রধানমন্ত্রী শহিদ সুরাবর্দী। কথায় বলে, পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতি কখনও মশা। সুরাবর্দী-সাহেবকে শুধু হাতি কেন, যাবতীয় ভূমিকাতেই একদিন দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য রকমের ভূমিকা ছিল তাঁর। কখনও তিনি বাঘ সেজেছেন, কখনও-বা ভিজে বেরাল। যখন যাতে সুবিধে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় লালবাজারের কণ্ট্রোল-রুমে যেমন তাঁকে দেখা গিয়েছিল, তেমনি আবার দেখা গিয়েছিল বেলেঘাটার গান্ধী-শিবিরেও। মনে হয়েছিল, মহাত্মার সান্নিধ্যে এসে সুরাবর্দীরও বুঝি-বা পরিবর্তন ঘটল। অতঃপর তিনি পাকিস্তানে গেলেন। ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিলেন, ফাল হয়ে বেরোলেন। একটু একটু করে এগোতে এগোতে, একটু একটু করে জমির দখল নিতে নিতে, পাকিস্তানের উজির-এ-আজমের গদিতে গিয়েও একদিন আসন নিলেন তিনি। তারপর আবার চাকা ঘুরেছে। চাকার উপরে যিনি বসে ছিলেন, ভাগ্যান্বেষী সেই মানুষটি আবার পথের প্রান্তে গিয়ে ছিটকে পড়েছেন। একা সুরাবর্দী কেন, অনেকেই। মিলিটারী শাসনের দাপটে আর তাঁদের রা কাড়বার যো নেই।

সুরাবর্দী আজ একজন সামান্য আইনজীবী মাত্র। শুনলাম, মামলা নিয়ে তিনি ঢাকায় এসেছেন, মামলা সেরেই আবার করাচীতে ফিরে যাবেন। অনুমান করতে পারি, মাত্র কয়েক মাস আগেও যদি ঢাকার এই শাবাগ হোটেলে তাঁর পদধূলি পড়ত, ম্যানেজার থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ বাটলারটি পর্যন্ত তাহলে তটস্থ হয়ে উঠত। উঠল না, তার কারণ, জমানা পালটে গিয়েছে।

বিষণ্ণ, পাংশু মুখ, লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। লিফ্‌টম্যান তাঁকে একটা সেলাম পর্যন্ত ঠুকল না।

তাড়াহুড়োর অন্ত ছিল না। কলকাতায় খবর পাঠিয়ে, স্নানাহার সেরে নিয়ে, প্রায় দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। অন্যান্য বন্ধুরা আগেই গিয়ে আসন নিয়েছিলেন। তাঁরা পাকা সাংবাদিক; দৌড়ঝাঁপের ব্যাপারে অনেক বেশী পোক্ত। আমার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন তাঁরা; এবং, আমার বিলম্ব দেখে, প্রায় সমস্বরেই আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন। তাঁদের দোষ দিতে পারিনে। তার কারণ, হাতে সত্যিই সময় ছিল না। এই মুহূর্তেই কার্জন হলে যেতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সেখানে ভাষণ দেবেন। সকলেই আশা করছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সভাটা যেহেতু একটা মেঠো মজলিস নয়, পাকিস্তানের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও যেহেতু সেখানে হাজির হবেন, আয়ুবের চিন্তাধারার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত হয়ত সেখানে পাওয়া যেতে পারে। এমন দু-একটা কথা হয়ত শোনা যেতে পারে, যা নিয়ে মোটা হরফের একটা হেডলাইন তৈরি করাও হয়ত অসম্ভব নয়। ব্যস্ততার, সুতরাং, কারণ ছিল।

ট্যাক্সি যখন কার্জন-হলের হাতায় গিয়ে ঢুকল, জানুয়ারির সূর্য তখন পশ্চিমে গড়িয়ে গিয়েছে। বাতাস তখন মন্থর, এবং আকাশ তখন বিষণ্ণ। রমনার মাটিতে অবশ্য মরসুমী ফুলের চক্ষু তখনও প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছিল। জিনিয়া, জিরানিয়াম, মেরিগোল্ড। চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম যে, শীতার্ত এই অপরাহ্ণেই তারা মিঠে এবং লাজুক একটি সৌন্দর্যের পশরা সাজিয়ে বসেছে। আকাশী বিষণ্ণতা তবু মুছে যায়নি। জানুয়ারি-দিনের পাংশু পাণ্ডুর আকাশটা যেন বেদনায় থমথম করছিল। এবং, আকাশী সেই বেদনার চিত্রটিকে আরও সম্পূর্ণ করে তুলবার জন্যেই কিনা জানিনে, কোথায় যেন কাক ডাকছিল একটা।

স্বীকার করা ভাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, সমাবর্তন-সভার জনারণ্যে বসেও আমি উন্মনা হয়ে গিয়েছিলাম। মাথার উপরে মস্ত বড় চন্দ্রাতপ ; পায়ের তলায় রঙিন গালিচা ; সামনে ডায়াস। উত্তীর্ণ ছাত্রেরা সবাই একে-একে সেই ডায়াসের উপরে উঠে আসছেন, হাতে ডিগ্রীপত্র নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাচ্ছেন একবার, তারপর আবার ফিরে যাচ্ছেন। সবই আমি দেখছিলাম। তবু যেন দেখছিলাম না। ভাইস-চ্যান্সেলরের ভাষণে যখন ঝোপের এ-দিকে ও-দিকে বিস্তর লাঠি চালিয়ে অতঃপর আসল কথাটা অর্থাৎ আরও-কিছু অর্থসাহায্যের আবেদন জানানো হল, তখনও তার মর্মার্থ আমার মরমে গিয়ে পৌঁছয়নি। আমি শুধু দেখছিলাম যে, দূরের আকাশটা আরও হিমেল, আরও অনচ্ছ হয়ে এসেছে। দেখছিলাম যে, রৌদ্রের দৃষ্টি আরও স্তিমিত হয়েছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের সুদীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীর শান্ত সমাহিত ভঙ্গীটি যেন ক্রমেই আরও ঘন, আরও নিবিড় হয়ে উঠছে। এই সমস্তই আমি দেখছিলাম ; এবং শুনতে পাচ্ছিলাম যে, ক্লান্ত বিষণ্ণ অদৃশ্য সেই কাকের কণ্ঠ তখনও থেমে যায়নি।

কী ভাবছিলাম আমি ? ভাবছিলাম যে, এর আগে আর ঢাকায় কখনও আসিনি বটে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট এই অট্টালিকা এবং বিস্তীর্ণ এই প্রাঙ্গণকে আমি চিনি। এদের কথা এর আগেও আমি পড়েছি, এর আগেও আমি শুনেছি। কোথায় ? কার মুখে ? তখন মনে পড়ল। মনে পড়ল যে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত এবং পরিমল রায় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। মনে পড়ল যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁর ছাত্রজীবনের কয়েকটা মাস এই ঢাকা শহরেই কাটিয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ ছিল মোহিতলালেরও। তবে ছাত্র হিসেবে নয়, অধ্যাপক হিসেবে। তাঁদের কারও বা সাহিত্যে, কারও বা পত্রগুচ্ছে, কারও বা আলাপ-

চারিতে এই বিশাল বাড়িটি, শুধু এই বাড়িটিই বা কেন, এর আশ-পাশেরও অসংখ্য দৃশ্য এসে উঁকি দিয়ে গিয়েছে। আমার নসট্যাল-জিয়ার সুতরাং কারণ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার এই পরিচয়কে আমি নতুন বলতে পারিনে।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। চমক ভাঙল আয়ুব খাঁর গলায়। নিস্তেজ গলা নয়, শক্ত মানুষের বজ্রকঠিন কণ্ঠ। আয়ুব তখন বলছেন, “এখানে পাঠ করবার জন্যে একটা ভাষণ আমি তৈরি করে এনেছিলাম বটে, কিন্তু সেই লিখিত ভাষণ আমি পড়ব না। এখানে এসে, আপনাদের বক্তব্য শুনে, আমার যা মনে হয়েছে, সেই কথাগুলিকে সরাসরি পেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথোপকথনের রীতিতেই সুতরাং কথা বলা যাক ; এ-ব্যাপারে ভাষণের ভঙ্গিতে আমার আস্থা নেই।”

বেশীক্ষণ সেদিন কথা বলেননি আয়ুব ; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কথা তিনি বললেন। বললেন সেই ইসলামী আদর্শের কথা, পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যা নাকি একটি সেতু রচনা করেছে। বললেন যে, এই আদর্শের বন্ধন রয়েছে বলেই পাকিস্তানের যে-কোনও অঞ্চলেই তিনি যান না কেন, নিজেকে তাঁর বিদেশী বলে মনে হয় না। বললেন যে, দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার পর যে-স্বাধীনতা তাঁরা পেয়েছেন, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। দাসত্বের পথে আর ফিরে যাওয়া চলবে না। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, “দাসত্ব একালে কমিউনিজ্‌ম-এর রূপ ধরেছে।”

ভাইস-চ্যান্সেলর হামিদুর রহমানের ভাষণে বুঝি অধ্যাপকদের বেতন-বৃদ্ধির একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। আয়ুব তার উল্লেখ করে বললেন যে, এই বৃদ্ধির ব্যাপারটা যেন একতরফা না হয়। মাইনে বাড়ুক, সেইসঙ্গে কাজও বাড়ুক। দেশকে গড়ে তুলবার জন্যে আজ

আরও শ্রমস্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে। সেই বাড়তি শ্রমকে হাসি-মুখেই মেনে নিতে হবে। বিশেষ করে এইজন্যে যে, "পাকিস্তান আজ বিপজ্জালে বেষ্টিত।"

সাংবাদিকদের পেনসিল বুঝি-বা মুহূর্তের জন্যে একবার থেমে গেল। যন্ত্রচালিতের মতই যেন একবার মুখ তুললেন তাঁরা। আয়ুবের দিকে ফিরে তাকালেন। প্রেসিডেণ্টের মুখের আয়নায় তাঁর মনের ছবিটাকে একবার দেখে নিতে চাইলেন। "পাকিস্তান আজ বিপজ্জালে বেষ্টিত?" কী বলতে চান আয়ুব? কার কথা বলতে চান?

আয়ুবের বক্তৃতা সেদিন ওইখানেই শেষ হয়নি। আরও দু-একটি কথা তিনি সেদিন বলেছিলেন। কিন্তু, সন্দেহ হয়, সেদিকে আর কারও মন ছিল না। মন ছিল না আমারও। মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন একটা তাল কেটে গিয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষ হল। ধীরেসুস্থে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। অমিতাভ বলল, "ভাল রেজাল্ট করে যারা প্রাইজ পেয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি হিন্দু ছেলেও আছে। দুজনেই ভট্‌চাজ-বামুন। দেখেছ?"

বললাম, "দেখেছি। দেখে খুশী হয়েছি। কিন্তু সে-কথা আমি ভাবছিনে।"

অমিতাভ বলল, "কী তুমি ভাবছ, আমি জানি। 'পাকিস্তান ইজ সারাউণ্ডেড বাই ডেঞ্জারস্!' এই ত?"

বললাম, "ঠিক। কিন্তু কথাটার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছিনে।"

অমিতাভ বলল, "আমিও না। ভালই হল। আবার যখন দেখা হবে, তখন প্রশ্ন তুলব।"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে জিজ্ঞেস করল, "কোন্‌হানে যামু সাহেব?"

এক গাল হেসে অমিতাভ বলল, "সাহেবরা যেখানে যেতে পারে। শাবাগ হোটেল।"

হোটেলে ফিরে হতবাক। মনে হল, ঢাকা শহরের চৌহদ্দির মধ্যে লেটেস্ট মডেলের যে-কখানা গাড়ি ছিল, তার সবগুলিকে যেন এই শাবাগ হোটেলের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝকঝকে টেল্‌ফিনওয়ালা সেই গাড়ির সারি ডিঙিয়ে, কোনওক্রমে, আমরা ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। এবং ঢুকেই দেখলাম যে, হোটেলের মধ্যে একবারে লক্ষ চাঁদের হাট বসে গিয়েছে। লাউঞ্জে, ডাইনিং হলে, কাউন্টারের সামনে, ঝুল-বারান্দার নীচে, এমন কি সিঁড়িতে অবধি পা রাখবার জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ। এবং কী সব মানুষ। কেউ-বা জাস্টিস, কেউ-বা মিনিস্টার, কেউ-বা কনসাল, কেউ-বা গবর্নর। অতিশয় উত্তম পোশাকে সজ্জিত হয়ে, হলুদ অথবা সাদা রঙের এক-একটা সফ্‌ট ড্রিঙ্ক হাতে নিয়ে, অতিশয় উত্তম ইংরিজীতে তাঁরা কথা কইছেন। মিহি, মোটা, ভারী, চিকন, নানান কণ্ঠের সব সম্ভাষণ এবং কপট বিস্ময়ের নানা অভিব্যক্তি মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছিল। "হাউ ডু য়ু ডু।" "ও, হাউ নাইস।" "ডিলাইটেড টু মিট য়ু।" "ও, নো, য়ু ডোণ্ট মীন ছাট।"

দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে, মুগ্ধ হতে হতে, এবং সেই মুগ্ধ অবস্থাতেই এঁর-ওঁর-তাঁর কনুইয়ের তলা দিয়ে সামনে এগোতে এগোতে এক সময় দেখলাম, সামনে নয়, এক্কেবারে সেই পিছন দিককার বারান্দায় গিয়ে পৌঁছে গিয়েছি। বারান্দাটা যথেষ্ট পরিমাণে আলোকিত নয়। কিন্তু সেই স্বল্পালোকেও দেখা গেল যে, আরও একটি মনুষ্যমূর্তি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

দূর থেকে মনে হয়েছিল, সুইস সাংবাদিক বার্নহাইম। কাছে গিয়ে

বুঝলাম, ভুল করেছি। ইনিও শ্বেতাঙ্গ বটেন, তবে বার্নহাইম নন। মার্জনা চেয়ে ফিরে আসছিলাম; স্খলিত কণ্ঠের আহ্বান শুনে আবার দাঁড়িয়ে যেতে হল।

ভদ্রলোক তখন বড় অদ্ভুত একটি অনুরোধ জানালেন। তাঁকে তাঁর আপন কামরায় নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। হুইস্কির গন্ধটা অবশ্য আগেই পেয়েছিলাম, কিন্তু হুইস্কি যে তাঁর চলচ্ছক্তি পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে, তা আমি বুঝতে পারিনি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বড় করুণ, বড় অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রলোক। বিনীত কণ্ঠে জানালেন, আমি যদি তাঁকে সাহায্য না করি, সারা রাত তাঁকে এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। "বাট আই'ম্ প্রিটি স্লীপি। অ্যাণ্ড আই'ম্ এনিথিং বাট অ্যান অর্স্। আই কাণ্ট স্লীপ অন মাই লেগ্স। আই জাস্ট কাণ্ট।"

যুক্তি একেবারে অকাট্য। ভদ্রলোকের ঘুম পেয়েছে। অথচ তিনি অশ্ব নন যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোবেন। তিনি মানুষ। সুতরাং, ঘুমোবার জন্যে তাঁর শোয়া দরকার। শোবার জন্যে একটি বিছানা দরকার। এবং বিছানার জন্যেই দরকার তাঁর আপন কক্ষে ফিরে যাওয়া। অতএব, 'হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো, সখা।'

বললাম, "চলুন। কামরার চাবিটা আপনার কাছে আছে ত?"

বললেন, "আই'ম্ অ্যাফ্রেড, নো। খুব সম্ভব হল-পোর্টারের কাছে আছে।"

হল-পোর্টারের কাছ থেকে চাবি সংগ্রহ করে, নিদ্রাকাতর সেই ভদ্রলোককে তাঁর আপন কক্ষে পৌঁছে দিয়ে আবার নীচে নেমে আসছিলাম, সিঁড়ির কাছে কহ্লনের সঙ্গে দেখা।

হিন্দুস্থান টাইম্স-এর প্রতিনিধি শ্রীদ্বারকানাথ কহ্লন অতি নির্বিরোধ, স্থিরবুদ্ধি এবং বন্ধুবৎসল মানুষ। কথা কয় অতি মৃদু গলায়, এতটুকুও শব্দ না করে চা খায়, এবং উত্তেজিত না-হওয়াটাই যখন

অস্বাভাবিক, তখনও উত্তেজিত হয় না। মিটিংয়ে গিয়ে নোট নেয় না; এবং এ-বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করলেই সে আঙুল দিয়ে তার আপন মাথায় গোটা কয়েক টোকা দিয়ে বলে, "সব মনে থাকবে। স---ব।"

কহ্লন বলল, "তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রেসিডেন্টের সম্মানার্থে আজ এখানে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছে; ডাইনিং হল্-এ তাই জায়গা পাওয়া যাবে না; এবং সময় থাকতেই তাই গ্রীল-রুমের একটা টেব্‌ল আমি বুক করে রেখেছি। চল।"

এগোতেএগোতে আবার বলল, "কাল ভোরেই আমরা ঢাকা ছাড়ছি, মনে আছে ত?"

ঢোঁক গিলে বললাম, "আছে।"

কহ্লন যখন জিজ্ঞেস করেছিল, পরবর্তী প্রত্যুষেই ঢাকা পরিত্যাগের কথা আমার মনে আছে কিনা, তখন ঢোঁক গিলে আমি তাকে জানিয়েছিলাম, আছে। ঢোঁক গিলবার কারণ ছিল। আমি ঘুমকাতুরে মানুষ, প্রাতরুত্থানের অভ্যাস আমাব নেই। তার জন্যে অবশ্য লজ্জারও অন্ত নেই। যে-কোনও সময়ে ঘুমিয়ে আবার যে-কোনও সময়ে শয্যাত্যাগে যাঁরা সমর্থ, চিরকালই আমি তাঁদের ঈর্ষা করেছি। ঈর্ষা করেছি তাঁদের সামর্থ্যের প্রথম ভাগের জন্যে নয়, দ্বিতীয় ভাগের জন্যে। যে-কোনও সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে কি আর আমিই পারিনে? আমিও পারি। কিন্তু যে-কোনও সময়ে উঠতে পারিনে। নিদ্রা আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ নয়। জীবনে তাই বার তিনেকের বেশী সূর্যোদয় দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আয়ুব খাঁকে ধন্যবাদ। যে দশদিন পূর্ববঙ্গে ছিলাম, সেই দশটি দিনই তিনি আমাকে সূর্যোদয়ের শোভা দেখিয়ে ছেড়েছেন।

সকাল সাড়ে ছটায় ঢাকা থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে। কিন্তু সরকারী সফর-তালিকায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে, যাত্রীরা যেন ছটার মধ্যেই গিয়ে যে-যাঁর বার্থের দখল নেন। এখন ছটার মধ্যে যদি স্টেশনে পৌঁছতে হয়, হোটেল থেকে রওনা হতে হয় তাহলে সাড়ে পাঁচটায়। তার আগে দাড়ি কামাতে হবে, স্নান করতে হবে। কোন্ না এক ঘণ্টা লাগবে তাতে? ঘুম থেকে, অতএব, সাড়ে চারটের মধ্যেই উঠে পড়া দরকার। মনে রাখবেন, এ সবই আমি পাকিস্তান-টাইমের হিসেব দিচ্ছি। পাকিস্তানের সাড়ে চারটে মানে কলকাতার চারটে। তার মানে প্রত্যুষ নয়, শেষ রাত্রি।

আমার যেন কান্না পেতে লাগল। আয়ুব না-হয় মিলিটারী মানুষ,

এক মুহূর্তের নোটিসে তিনি শয্যাত্যাগ করতে পারেন, তৈরি হয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আমি ত আর মিলিটারী নই। নেকটাইয়ের গেরো বাঁধতে আমার দশ মিনিট লাগে, দাড়ি কামাতে আধঘণ্টা। তাহলে? সত্যি কথাই বলব, ঘুম থেকে উঠতে পাছে দেরি হয়ে যায়, এই নিদারুণ উদ্বেগে একুশে জানুয়ারির রাত্রে আমার ঘুমই হল না।

বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে রাত তিনটের সময় মনে হল, একা আমিই বা এই বিনিদ্র রজনীর দুঃখভোগ করি কেন, এবারে বরং অমিতাভকেও তুলে দেওয়া যাক। অমিতাভকে তুলে দিতেই সে আবার প্রস্তাব করল, "একা আমরাই বা কেন না-ঘুমিয়ে কড়িকাঠ গুনি? তার চাইতে বরং অনিল আর সত্যেনকেও তুলে দেওয়া যাক।"

অনিল, সত্যেন আর ওসমানী আমাদের পাশের ঘরেই ছিল। দরজায় ধাক্কা দিতেই বলল, "কষ্ট করে আর তুলে দিতে হবে না। আমরা জেগেই আছি।

তৈরী হয়ে যখন নীচে নামলাম, হোটেলের ঘড়িতে তখন পাঁচটা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখি সুইস সাংবাদিক বার্নহাইম আর সিলোন টাইম্‌স-এর উইলসনও নীচে নেমে এসেছে। কহ্লন নামল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। স্যুটকেশটাকে নামিয়ে রেখে নির্বিকার নিরুত্তেজ কণ্ঠে বলল, "দেরি হয়নি ত? আমার আবার তাড়াহুড়ো সয় না।"

রাস্তায় তখনও দিনের আলো ফোটেনি। ঢাকা তখনও ঘুমুচ্ছে। শেষ-রাত্রির সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যেই গাড়ি ছুটল স্টেশনের দিকে। শীতের রাত্রিশেষ। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে হেড-লাইটের আলোয় দেখতে পাচ্ছি, এখানে ওখানে একটি-দুটি কুকুর দিব্যি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আলোর ছটায় মুহূর্তের জন্যে

আমাদের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে তারা। পথের পাশের গাছগুলিকে যেন ভূতের মতন দেখাচ্ছে। টানা, চওড়া রাস্তা। হেডলাইটের খড়গ তাকে ফেঁড়ে দিয়েছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। হাত দুখানাকে কোলের উপর জড়ো করে একেবারে নির্বাক হয়ে বসে আছে সবাই। সেই গাঢ়, গহন স্তব্ধতার মধ্যে রহমান-ড্রাইভারের গলাটাকে যেন বড্ডই বেখাপ্পা শোনাল।

"হ্যাহেন, হ্যাহেন কর্তা, কাণ্ডডা একবার হ্যাহেন। মতলব করছে, আমারে আগে যাইতে দিব না।"

চেয়ে দেখি, খান পঁচিশেক মোটর-সাইকেল। কখন যে তারা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে, বুঝতে পারিনি। চালকদের পোশাক দেখে মনে হল, তারা সামরিক বাহিনীর লোক; ভঙ্গি দেখে মনে হল, আর-কেউ তাদের আগে যাক, এ তাদের পছন্দ নয়। পিছনের লোকের পথ আটকে দিয়ে, অত্যন্তই শ্লথগতিতে, যে-গতি কিনা মোটর-সাইকেলের পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়, তারা গাড়ি চালাচ্ছে।

বললাম, "ভাই রহমান, ওদের কোমরে যদি রিভলবার থাকে, আমি অবাক হব না, এবং ওদের মস্তিষ্কে যদি বুদ্ধি থাকে, আমি বিস্মিত হব। তুমি, সুতরাং, ধীরে-সুস্থেই গাড়ি চালাও।"

রহমান আর একটি কথাও বলল না। শুধু অকস্মাৎ তার স্পীড বাড়িয়ে দিল। মুহুর্মুহু হর্ন দিতে দিতে, একটার-পর-একটা মোটর-সাইকেলকে ওভারটেক করতে করতে, ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে সে যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল, ছটা বাজতে তখন আর দেরি নেই।

গাড়ি থামিয়ে পিছনে তাকাল রহমান। তখনও ভোর হয়নি। কিন্তু অন্ধকারেই দেখতে পেলাম যে, তার চোখের তারা যেন ঝিকিয়ে উঠেছে। চাপা হেসে বলল, "কর্তা, আমরার কাম কি ওই সাইকেল-

আলাগোর থিকা কিছু কম জরুরী? তানাগোর অবশ্যই কাম থাকপার পারে; কিন্তু আমরাও তো এই শ্যাষ রাইতে নিহাইত বাতাস খাইতে বাইরই নাই।"

লম্বা স্পেশাল ট্রেন। এদিক থেকে ওদিকে পৌঁছতে প্রায় মিনিট দশেক লাগে। আমাদের কম্পার্টমেণ্টে দেখি চারজনকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। আমাকে, আস্‌রে জাদির ওসমানীকে, রেডিও-পাকিস্তানের নিউজ-এডিটর আনোয়ার আমেদকে আর পাকিস্তান অবজার্ভারের এনায়েতুল্লাকে। জার্মান কোচ্; সুখসুবিধের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। ফ্যানের ব্লেড থেকে বালিশের ওয়াড়, প্রতিটি জিনিসই একেবারে ধবধব করছে।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই যে আমরা ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়লাম, সাতদিনের আগে আর এখানে ফেরা হবে না। মাঝখানে অবশ্য বার দুয়েক এসে ঢাকার বুড়ীকে ছুঁয়ে যেতে হবে, কিন্তু সে-ছোঁয়া নেহাতই দায়সারা গোছের। চট্টগ্রাম থেকে পি-আই-এর প্লেনে এসে আমরা তেজগাঁও এয়ারপোর্টে নামব, এবং তেজগাঁও থেকে একেবারে সিধে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে স্টীমারে উঠব। ফিরতি পথেও তাই। গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে এসে আমরা নারায়ণগঞ্জে নামব, এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় এসে গোটা দুয়েক মিটিং সেরেই আবার ট্রেনে গিয়ে উঠতে হবে। পাকাপাকি-ভাবে ঢাকায় ফিরব ঠিক এক সপ্তাহ বাদে ; তার আগে নয়।

কিন্তু নব্যকালেব ঢাকার একটা বর্ণনা শুনবার জন্যে যিনি উদ্গ্রীব হয়ে আছেন, সেই পাঠককে কি ততদিন ঝুলিয়ে রাখা উচিত হবে ? তার চাইতে বরং বর্ণনাটা তাঁকে এই মুহূর্তেই শুনিয়ে দেওয়া যাক। কাজটা বেখাপ্পা হবে না। তার কারণ, আমাদের ট্রেন এখনও ঢাকার সীমানা পার হয়ে যায়নি।

একটা ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই। আজ থেকে দশ বছর আগে যিনি ঢাকা ছেড়েছেন, আজ যদি তিনি আবার ঢাকায় ফিরে আসেন, পূর্ববঙ্গের এই বৃহত্তম শহরটিকে তিনি আর চিনতে পারবেন না। ঢাকার একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

আগে যেখানে কলেজ ছিল, এখন সেখানে সরকারী দফ্তর বসেছে ; আগে যেখানে মাঠ ছিল, এখন সেখানে বাড়ি উঠেছে ; আগে যেখানে বাড়ি ছিল, এখন সেখানে রাস্তা বেরিয়েছে ; এবং আগে যেখানে ছ্যাকরা-গাড়িও চলত না, এখন সেখানে ট্যাক্সি ছুটছে।

টিকাটুলি, নবাবপুর আর উয়াড়ি কি তাই বলে হাওয়ায় মিলিয়ে

গিয়েছে ? তা কেন যাবে। টিকাটুলির সেই গা-ঘেঁষা গলিও আছে, এবং উয়াড়ির সেই অমায়িক ধূলি-ধূসরতাও অবশ্যই বিদায় নেয়নি। কিন্তু এয়ারপোর্টে নেমেই ত আর আপনি মন্ত্রবলে সেই পুরনো ঢাকায় পৌঁছে যাচ্ছেন না। সেখানে যদি যেতে হয়, তবে নিউ টাউনের মধ্য দিয়েই আপনাকে যেতে হবে। যেতে হবে আয়ুব অ্যাভেন্যু, জিন্না সড়ক আর হেয়ার স্ট্রীট দিয়ে। এবং যেতে যেতেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, ঢাকা আর সেই-ঢাকা নেই।

থাকা অবশ্য সম্ভবও ছিল না। ঢাকা আর আজ মফস্বল-শহর নয়, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আগেও ছিল। কিন্তু হাইকোর্ট ছিল না। ঢাকায় এখন হাইকোর্ট হয়েছে। স্টেডিয়াম ছিল না। স্টেডিয়াম হয়েছে। নিউ মার্কেট ছিল না। নিউ মার্কেট হয়েছে। রাত নটাতেও সেখানে দোকান বন্ধ হয় না, আলোর ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আর হয়েছে খবরের কাগজ। ঢাকা থেকে এখন একটি-দুটি নয়, সাত-আটটি কাগজ ছেপে বেরুচ্ছে। ছ পাতার কাগজ, দশ পয়সা দাম। পৃষ্ঠা-সংখ্যার অনুপাতে দামটা একটু বেশী ঠেকছে? ঠেকাই স্বাভাবিক। "কিন্তু." পাকিস্তানের এক সাংবাদিক-বন্ধু বললেন, "আমরা এক্ষেত্রে নিরুপায়। কাগজ ত দেখেছেন। বিজ্ঞাপন একেবারে ঢুঢু। দাম না বাড়িয়ে তাই উপায় নেই।"

বিজ্ঞাপন যে একেবারে নেই, তা অবশ্য নয়। আছে। কিন্তু তার অধিকাংশই হল সিনেমা, নিলাম, অথবা খুচরো কারবারের বিজ্ঞাপন।

"বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন যে দেখছিনে?"

"বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানই কি দেখছেন? তারা যদি থাকত, তবে তাদের বিজ্ঞাপনও থাকত। না, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বারোটি বছর কাটল, কিন্তু ঢাকায় এখনও বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠেনি।"

এইটেই হল মস্ত বড় প্যারাডক্স। শিল্পের দেখা নেই, কিন্তু ঢাকা ইতিমধ্যেই শিল্প-নগরীর চেহারা নিয়েছে। না-নিয়ে তার উপায়ও অবশ্য ছিল না। ঢাকা এখন রাজধানী-শহর। সুতরাং তার অন্দরের খবর যা-ই হক, বাইরে একটা ফেসলিফটিংয়ের দরকার। নম্র, শান্ত, গ্রাম্য ঢাকার মুখের উপরে, অতএব, গত দশ-বারো বছর যাবৎ প্রসাধনের প্রলেপ পড়েছে।

ঢাকায় আগে চোখ-ধাঁধানো একটা হোটেলও ছিল না। এখন আছে। সিনেমা হলের সমারোহ ছিল না। এখন হয়েছে। স্টুডিও ছিল না। স্টুডিও এসেছে। আর্ট-গ্যালারি ছিল না। তা-ও খুলেছে। আর ট্যুরিস্ট। সাদা-চামড়া দাতাকর্ণ ট্যুরিস্ট। হোটেলে এবং হোটেলের বাইরে উদার হস্তে টাকা ঢালছে তারা। ফটো তুলছে, ফূর্তি লুঠছে, মোটর হাঁকাচ্ছে। মাত্র দশ বছর আগেও কি কেউ ভাবতে পারত যে, ঢাকা শহরের ধুলো উড়িয়ে একদিন এত অজস্র মোটর ছুটে বেড়াবে, এবং সেই চল্‌তি মোটর থেকে- বাংলা নয়, এমন কি, সর্বক্ষেত্রে উর্দুও নয় --সানুনাসিক ইংরেজী-আলাপের ঝঙ্কার ভেসে আসবে?

ঢাকা সত্যিই পালটে গিয়েছে। কিন্তু, পুরনো আমলের বাসিন্দারা যতই দীর্ঘশ্বাস ফেলুন না কেন, তাহের মিঞার তাতে দুঃখ নেই। নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে এসে তার সাইকেল-রিকশায় উঠেছিলাম। রিকশা যখন শাবাগ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল, নিয়নের আলোয় চারদিক তখন ঝলমল করছিল। হোটেলের ঠিক সামনে, আয়ুব অ্যাভেন্যুর উপরে, একটা মস্ত বড় ফোয়ারা। সেই ফোয়ারার জলেও দেখলাম আলোর ছোঁয়া লেগেছে।

ভাড়া নিয়েই কিন্তু বিদায় নিল না তাহের। ফোয়ারাটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "এলায় করছে কী! রাইতরে এক্কেরে দিন বানাইয়া থুইছে।"

স্পেশাল ট্রেন থেকে, কথার সুতো ছাড়তে ছাড়তে, অনেক দূরে চলে এসেছি। কিন্তু এসেই যখন পড়েছি, ট্রেনের কামরায় ফিরবার আগে তখন আরও দু-একটি জরুরী প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে নেওয়া ভাল। জানিয়ে রাখা ভাল, আয়ুব কেন পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন।

আয়ুব যে পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন, আমার মনে হয়, তার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল দুটি। দেওয়া এবং নেওয়া। 'বেসিক ডিমোক্রেসি' কাকে বলে, পুব-বাংলার মানুষদের তিনি তা বুঝিয়ে দেবেন; এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুব-বাংলার মানুষরা তাঁকে চায় কিনা, তিনি সেটা জেনে নেবেন। দেওয়া-নেওয়ার পর্ব সমাধা করে তিনি আবার স্বস্থানে—রাওয়লপিণ্ডিতে—ফিরে গিয়েছেন।

পাঠকের মনে থাকতে পারে, এই ভ্রমণ-বিবরণীর সূত্রপাতেই একবার 'বেসিক ডিমোক্রেসি'র উল্লেখ করা হয়েছিল। তখন আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, পরে আবার এ-বিষয়ে আলোচনা করব। সে-আলোচনা এখনই করা যেতে পারে। তবে তারও আগে আবার আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরমুহূর্তেই—১৯৫৮ সনের ৮ই অক্টোবর তারিখে—জাতির উদ্দেশে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন আয়ুব খাঁ। তাতে তিনি বলেছিলেন, "Let me announce in unequivocal terms that our ultimate aim is to restore democracy." কথাটা সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপন হাতে ডিমোক্রেসির অবসান ঘটিয়ে অতঃপর মার্শাল ল-য়ের সাহায্যে যাঁকে দেশশাসন করতে হচ্ছে, গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সত্যিই খুব প্রবল কিনা, তা নিয়ে তর্ক ওঠা স্বাভাবিক। আয়ুব যে শুধুই গণতন্ত্রের অবসান

ঘটিয়েছিলেন, তা নয়। আম-জনতা সম্পর্কেও তাঁর দু-একটি উক্তিতে ঈষৎ তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, শাসন-ব্যবস্থার যে-সব পরিবর্তন তাঁর কাম্য, জনসাধারণ যদি সেগুলিকে পছন্দ না করে, কী করবেন তিনি সেক্ষেত্রে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "লট্‌স অব পীপল আর ব্লাডি ফুল্‌স।" বলা বাহুল্য, এমন উক্তি, আর যাঁকেই হক, গণতন্ত্রের উপাসককে মানায় না। এবং জনসাধারণ সম্পর্কে এমন অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক উক্তি যিনি অক্লেশে করতে পারেন, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, গণতন্ত্রের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা বিশেষ প্রবল নয়।

এই উক্তির পাশাপাশি আবার এমন আর-একটি উক্তিকেও এখানে উদ্ধৃত করতে পারি, যার ফলে শুধু গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা নয়, গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা নিয়েও হয়ত প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্ন উঠবে, গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে সত্যিই কোনও পরিচ্ছন্ন ধারণা তাঁর আছে কিনা। ডিক্টেটরশিপ আর ডিমোক্রেসি যে এক বস্তু নয়, বরং পরস্পরবিরোধী দুটি ব্যবস্থা, এই মূল কথাটা, আশা করি, সকলেই মেনে নেবেন। মেনে নেবেন যে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক নয়। অথচ, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পাকিস্তানে যখন মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হল, সামরিক একনায়কত্ব আর গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে কোনও পার্থক্যই আয়ুব সেদিন দেখতে পাননি। দেখতে পেলেও স্বীকার করেননি। বরং অন্যদেরও তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ধরনটা একটু ভিন্ন বটে, কিন্তু এও একরকমের গণতন্ত্রই। পাকিস্তানে কি গণতন্ত্রের অবসান ঘটল, এই আপাত-অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, "তা কেন হবে। Any country which does not have a Communist dictatorship has some form of democracy." আমার জিজ্ঞাস্য, সত্যিই যিনি

গণতন্ত্রের উপাসক, আয়ুবের এই কথাটাকে মেনে নেওয়া কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে? হবে না। মেনে নিলে যেহেতু গণতন্ত্র একটা নঞর্থক আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু গণতন্ত্র ত একটা নঞর্থক আদর্শ নয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে অবশ্য গণতন্ত্রের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম না-থাকলেই যে একটা রাষ্ট্রে কোনও-না-কোনও প্রকারের ডিমোক্রেসি থাকবে, এমনও কোনও নিয়ম নেই। নাৎসি জার্মানি কি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ছিল? ছিল না। কিন্তু সে-জার্মানি কি তাই বলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল? তা-ও ছিল না। ফ্রাঙ্কোর স্পেনও ত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নয়। কিন্তু কমিউনিস্ট নয় বলেই যে সেখানে 'সাম ফর্ম অব ডিমোক্রেসি'র পতাকা উড়ছে, এমনও বলতে পারিনে। বলা সম্ভব ছিল না পেরনের আর্জেন্টিনা সম্পর্কে। বলা সম্ভব নয় সালাজারের পর্তুগাল সম্পর্কেও। আসল কথা, ডিমোক্রেসির অর্থ নেহাত 'নেগেশন অব কমিউনিজ্‌ম' নয়। তার চাইতে বেশী কিছু। তার চাইতে বড় কিছু। ডিমোক্রেসির একটা আলাদা, পজিটিভ অর্থ আছে। আলাদা কনোটেশন আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুখে যা-ই বলুন না কেন, আয়ুব নিজেও কি তা জানেন না? জানেন। এবং জানেন বলেই তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, গণতন্ত্রকে তিনি 'রেস্টোর' করবেন। বলা বাহুল্য, মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ যদি গণতন্ত্র হত, 'রেস্টোরেশনের' কোনও প্রশ্নই তাহলে উঠত না।

কিন্তু আয়ুব অতি হুঁশিয়ার ব্যক্তি। গণতন্ত্রকে তিনি 'রেস্টোর' করবেন হয়ত। তবে তার আগে এই একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে নেবেন যে, সে-গণতন্ত্র সুযোগসন্ধানী চক্রান্তবাজ কিছু রাজনৈতিক নেতার স্বার্থসিদ্ধির রঙ্গভূমি হয়ে উঠবে না।

পাকিস্তানের গণতন্ত্র—আয়ুবের আগমনের পূর্বে—যে সেই রঙ্গভূমিই হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ভাগ্যান্বেষী, স্বার্থপর কিছু রাজ-

নৈতিক নেতা তখন, গণতন্ত্রেরই সুযোগে, জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলেছেন। জনসাধারণের ভোটাধিকার ছিল। কিন্তু সাক্ষরের সংখ্যা যেখানে শতকরা মাত্র ষোল, ভোটের ব্যাপারটাকে একটা প্রহসনে পরিণত করতেও সেখানে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। ইস্কান্দর মির্জার কথা যদি সত্যি হয়, তবে বুঝতে হবে, পাকিস্তানে মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার অল্প-কিছুকাল আগে করাচির এক নির্বাচনে শতকরা মাত্র আঠাশটি ভোট পাওয়া গিয়েছিল, এবং সেই অত্যল্প ভোটেরও অর্ধেকই ছিল জাল। শুধু করাচি কেন, অন্যত্রও এই একই কাণ্ড ঘটেছে। ঘটতে পেরেছে, তার কারণ, পাকিস্তানের নেতৃ-পদে তখন যাঁরা আসীন ছিলেন, দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য কোনও মাথাব্যথাই তাঁদের ছিল না। তাঁদের লোভ ছিল নির্বাধ, এবং ক্ষুধা ছিল প্রচণ্ড। এ-কথা আমি সকলের সম্পর্কে বলছিনে। কিন্তু অনেকের সম্পর্কেই বলছি। গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে গণতন্ত্রকেই তাঁরা ধুলোয় টেনে নামিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক অধিকারের এর চাইতে চূড়ান্ত অপমান আর কী হতে পারে। জাল-ভোটে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন (অনেকেই হয়েছেন), তাঁদের যদি কেউ জাল-নেতা আখ্যা দেয়, তাকে আমি দোষ দিতে পারিনে। যে-গণতন্ত্র একটা প্রহসন মাত্র, তাকে যদি কেউ অশ্রদ্ধা করে, তাকে আমি দোষ দিতে পারিনে। আয়ুবকে আমি দোষ দিতে পারিনে। আয়ুব এসে গণতন্ত্রের শরীরটাকেই শুধু কবর দিয়েছেন। পাকিস্তানী গণতন্ত্রের মৃত্যু তার অনেক আগেই ঘটেছিল।

ইস্কান্দর তখনও বিদায় নেননি। কিন্তু আয়ুব তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুর্নীতির শিকড় শুধু একটি-দুটি স্তরে নয়, সর্বস্তরেই প্রসারিত হয়েছে। এখন আর নরম কথায় কাজ হবে না, শক্ত হাতে চাবুক চালানো দরকার। গণতন্ত্রের কবরের উপরে দাঁড়িয়েই সেই চাবুক

তিনি চালালেন। নীরক্ত নির্বিকার গলায় ঘোষণা করলেন, "গোপনে খাদ্যশস্য মজুত করার শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে।"

এই একটিমাত্র ঘোষণাতেই যে ফল পাওয়া গেল, তা হয়ত আয়ুবেরও অপ্রত্যাশিত ছিল। মৃত্যুভয় বড় মারাত্মক ভয়। এবং সেই সম্ভাব্য মৃত্যুর বার্তাটা যখন কোনও ফৌজী মানুষের ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, আতঙ্কের তখন আর সীমা থাকে না। সাধারণ কারবারীদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, মাত্র দুদিন আগেও যিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনীতিক মালিক ফিরোজ খাঁ নুনকেও সেদিন তাই সভয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তিনিও তাঁর গুদামে কিছু গম মজুত করে রেখেছেন। বেশী নয়, মাত্র তিন হাজার টন! আর দুজন প্রাক্তন মন্ত্রীও এসে তড়িঘড়ি জানিয়ে গেলেন যে, তাঁদের ভাণ্ডারেও কিছু গম আছে বটে। যথাক্রমে দু হাজার এবং দেড় হাজার টন! প্রাক্তন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মহম্মদ আয়ুব খুরোর বিরুদ্ধে চোরা-কারবারের অভিযোগ ছিল। তিনি জেলে গেলেন। এবং, তার চাইতেও শোকাবহ ব্যাপার, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জামিন পর্যন্ত দিলেন না।

আয়ুব কিন্তু ওইখানেই থেমে থাকেননি। মুহুর্মুহু চাবুক চালিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তী চাবুক পড়ল অফিসার-চক্রের উপরে। মন্ত্রীরা যেখানে মজুতদার হয়, অফিসাররাই বা সেখানে অসাধু হবে না কেন। দুর্নীতি, দুর্নীতি, দুর্নীতি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবন যেন ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। এবং তা যে কারও অজানা ছিল, এমনও নয়। স্ক্রিনিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর ১৩৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২২১ জন, এবং তৃতীয় শ্রেণীর সহস্রাধিক সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাই যখন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল, কেউই তাতে বিস্মিত হয়নি।

সামরিক শাসনের আমলে পাকিস্তান সরকারের প্রায় হাজার তিনেক কর্মচারীকে এ-যাবৎ চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে, আর নয়ত

উপরতলার চাকরি থেকে নীচের তলায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তার ফল হয়েছে অসামান্য। ঢাকার এক ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, "ঘুষ নেওয়া যে বন্ধ হয়েছে, এমন বলতে পারিনে। কিন্তু একটা কথা সত্যি। হাত বাড়িয়ে ঘুষ নেবার আগে যে-কোনও অফিসারকে এখন তিনবার চিন্তা করতে হয়। ভেবে দেখতে হয়, হাতটা শেষপর্যন্ত কাটা পড়বে না ত?"

আয়ুব, আমি আগেই বলেছি, অতি হুঁশিয়ার ব্যক্তি। তিনি জানেন, রৌদ্রের আয়ু অনন্ত নয়। বেলা থাকতেই, সুতরাং, খড় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। তিনি জানেন, গনগনে আগুনও এক সময় নিবে যায়। লোহাটাকে, সুতরাং, পিটে যেতে হবে যতক্ষণ সে গরম আছে। অসাধু অফিসারদের চাকরি খেয়ে, মজুদ্দারদের সজুত করে দিয়ে এবং প্রকাশ্য রাজপথে চোরাকারবারীদের বেত লাগিয়েও তাই তাঁর মনে হল না যে, ঢের হয়েছে, এবারে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। সিগারেট, চিনি, সাবান এবং খাদ্যশস্যের মূল্য ইতিমধ্যে শতকরা দশ থেকে তিরিশ টাকা হ্রাস পেয়েছিল এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলিও ইতিমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটায় সকলেই খুশী হয়েছিলেন, এবং দ্বিতীয়টাতেও কেউ আপত্তি জানাননি। আপত্তি জানাবার উপায়ও অবশ্য ছিল না। সুতরাং, নিশ্চিন্ত চিত্তে আয়ুব এবারে—আলাদা-আলাদাভাবে—পাকিস্তানী নেতাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন। গঠিত হল নতুন দুটি শব্দ। PODO আর EBDO। বড় ভয়ঙ্কর দুটি শব্দ। পাঠক অবশ্যই খবর রাখেন যে, কিছুদিন আগেও যাঁদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম এবং দাপট ছিল অপ্রতিহত, মিতাক্ষর এই শব্দ দুটিই সেই পাকিস্তানী পলিটিশনদের হাত-পা এখন বেঁধে দিয়েছে। তাঁদের অবস্থা হয়েছে প্রায় পুতুলের

মত। হস্ত আছে কিন্তু নাড়িতে পারেন না; চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পারেন না; কর্ণ আছে কিন্তু বধির।

খুলে বলি। পোডোর পুরোনাম 'পাবলিক অফিসেস ডিস-কোয়ালিফিকেশন অর্ডার' আর এবডোর পুরো নাম 'ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার'। পোডোর উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য অতি প্রাঞ্জল। "...to disqualify those corrupt politicians from standing for election for a period of seven years who misused their power and position to the detriment of public interest." এবডো হচ্ছে পোডোরই পরিপূরক। তার কাজ আর কিছুই নয়, পূর্বোক্ত 'করাপ্‌ট্‌' পলিটিশনদের বিচারের জন্য "setting up of Tribunals headed by High Court Judges." এ ছাড়া আবার একটি সেণ্ট্রাল পাবলিক অফিসেস (মিস্‌কনডাক্ট) এনকোয়েরি কমিটিও গঠিত হয়েছে। ভূতপূর্ব কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি এমন সন্দেহ দেখা দেয় যে, ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি রাখেননি কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছেন কিংবা পাবলিকের টাকা মেরে দিয়েছেন, এই কমিটি তাহলে সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পোডো আর এবডোর সম্যক পরিচয়-দানের জন্য এবারে সাম্প্রতিক একটি খবর এখানে তুলে দিচ্ছি।

> ঢাকা, ১৩ই ফেব্রুয়ারি—এবডো-মামলার বিচার করিবার জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খাঁ-কে সেই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির হইতে বলা হয়। সরকারীভাবে জানা যায় যে, এবডো-আদেশে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগে তাঁহার উপরে নোটিস জারী করা

হইতেছে। গত সপ্তাহে পূর্ব-পাকিস্তানের আরও পাঁচজন প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতার উপরেও অনুরূপ নোটিস জারী করা হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার এবং প্রাক্তন স্পীকার জনাব আবদুল হাকিমও তন্মধ্যে আছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৬৬ সনের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত যদি তাঁহারা রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তবে আর তাঁহাদের ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির হইতে হইবে না।

জনাব আতাউর রহমান খাঁ এবং জনাব আবু হোসেন সরকারের রাজনৈতিক জীবন যে ঠিক কেমন ছিল, আমি জানিনে। এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ভূতপূর্ব বিধান-সভার ভূতপূর্ব স্পীকার জনাব আবদুল হাকিমের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মাত্র এইটুকুই আমি জানি যে, সরকার-সমর্থক জনাকয়েক এম-এল-একে তিনি অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। মন্ত্রিসভার পতন তার ফলে অনিবার্য হয়ে ওঠে। সরকারী দল অবশ্য তার প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের ফলে স্পীকারকে সেদিন তাঁর আসন থেকে নেমে আসতে হয়েছিল এবং বিধান-সভার প্রাঙ্গণ থেকে প্রাণভয়ে পালাতে হয়েছিল। পালাবার পর তাঁকে 'উন্মাদ' বলে ঘোষণা করা হল, এবং ডেপুটি স্পীকার শহিদ আলিকে এনে স্পীকারের আসনে বসিয়ে দেওয়া হল। শহিদ আলির স্পীকার-জীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বস্তুত, স্পীকার হবার ফলে তাঁর জীবনই অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়ে দাঁড়াল। 'অযোগ্য' সদস্যদের তিনি আবার 'যোগ্য' বলে ঘোষণা করলেন, এবং তার পরমুহূর্তেই দেখা গেল যে, বিরোধী দলের ক্রোধের আগুন

একেবারে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে। পেপারওয়েট, ডেস্কের কাঠ, মাইক্রোফোনের ডাণ্ডা—একটার-পর-একটা অস্ত্র এসে তাঁকে আঘাত হেনে যেতে লাগল। আবতুল হাকিম পালাতে পেরেছিলেন; শহিদ আলি পারলেন না। রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিধান-সভাতেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসাও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মূর্ছা আর ভাঙেনি।

শহিদ আলির মৃত্যুর সঙ্গে আবতুল হাকিমের কোনও যোগ ছিল কিনা, থাকলেও কতটুকু ছিল, আমার জানা নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হওয়ার চাইতে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে 'স্বেচ্ছায়' সরে পড়াকেই যদি অনেকে আজ শ্রেয় জ্ঞান করেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। বিস্ময়ের কিছু থাকবে না, যদি দেখি যে, আতাউর রহমান খাঁ-ও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপরে 'স্বেচ্ছায়' একটা দাঁড়ি টেনে দিয়েছেন। "সাত বছরের মধ্যে আর রাজনীতি করব না," এই রকমের একটা মুচলেকা দেওয়া যে অত্যন্তই অসম্মানজনক, তা আমি জানি। জেনেও যে এ-কথা বললাম, তার কারণ, পাকিস্তানী রাজনীতিকদের সামনে এ ছাড়া অন্য কোনও পথও আর আজ খোলা নেই। এ-রকম মুচলেকা এর আগেও অনেকে দিয়েছেন, পরেও অনেকে দেবেন। এবডোর জালে তাঁরা ধরা পড়বেন, এবং পোডোর দরজায় আপনাপন রাজনৈতিক জীবনকে গচ্ছিত রেখে তাঁরা বেরিয়ে আসবেন। তাঁরা ট্রাইব্যুনালের সামনে যাবেন না। না-যাবার কারণ, তাঁদের অনেকের জীবনই অকলঙ্ক নয়, তাঁদের অধিকাংশের কাবার্ডেই হয়ত একটি-চুটি কঙ্কাল আছে। তাঁদের আশঙ্কা, ট্রাইব্যুনালের বিচারে হয়ত কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। কিংবা—সাপ বেরোবার সম্ভাবনা যেখানে নেই—কেঁচোকেই হয়ত সাপের মতন করে দেখানো হবে। পাকিস্তানী নেতারা, সুতরাং,

মুচলেকার পথটাকেই বেছে নিচ্ছেন। তাতে মান যাবে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে টান পড়বে না।

আয়ুব বলেছিলেন, গণতন্ত্রের 'রেস্টোরেশন'ই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু একই সঙ্গে আবার এই জরুরী কথাটাও তাঁর জানিয়ে দিতে কোনও দ্বিধা হয়নি যে, গণতন্ত্রকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে, সেই পুরনো পার্টিগুলিকে তিনি আপাতত আর রেস্টোর্ড হতে দেবেন না। পুরনো পলিটিশনদেরও না। পার্টিগুলিকে তিনি নিশ্চিহ্ন করেছেন, পলিটিশন-দের তিনি পুতুলে পরিণত করেছেন, এবং এমন একটা অবস্থার তিনি সৃষ্টি করেছেন, গণতন্ত্রের প্রাথমিক পর্ব নিয়ে যখন আবার একটা পরীক্ষা সম্ভব হতে পারে। সেই প্রাথমিক পর্বেরই তিনি নাম দিয়েছেন বেসিক ডিমোক্রেসি।

ভূমিকাটা দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু বেসিক ডিমোক্রেসি সম্পর্কে কিছু বলবার আগে পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের এই চিত্রটা যদি না তুলে ধরতাম, বুনিয়াদী গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য তাহলে অনচ্ছ থেকে যেত। পাঠককে এখন আশ্বাস দিতে পারি, ভূমিকা যতখানি জায়গা নিয়েছে, আসল বিষয়টির আলোচনায় তার সিকি জায়গাও লাগবে না।

বুনিয়াদী গণতন্ত্রকে 'চারতলা গণতন্ত্র' নামেও আখ্যাত করতে পারি। এর একতলায় থাকবে ইউনিয়ন-পঞ্চায়েত, দোতলায় তহশিল অথবা থানা-কাউন্সিল, তিনতলায় জেলা-কাউন্সিল আর চারতলায় ডিভিশন-কাউন্সিল।

ইউনিয়ন-পঞ্চায়েতের সদস্য-সংখ্যা হবে মোটামুটি পনের। দশজন নির্বাচিত আর পাঁচজন মনোনীত। প্রতি এক হাজার থেকে দেড় হাজার গ্রামবাসীকে নিয়ে একটি করে ইউনিট গড়া হবে, এবং সেই ইউনিট থেকে—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে—একজন করে

সদস্য নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন-পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বিচার, শান্তিরক্ষা, উন্নয়ন এবং জাতীয় পুনর্গঠনের যা-কিছু কাজ, পঞ্চায়েতই তার তত্ত্বাবধান করবেন।

পরের ধাপটিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে বলা হচ্ছে তহশিল-কাউন্সিল; পূর্ব-পাকিস্তানে থানা-কাউন্সিল। এর আর কোনও আলাদা নির্বাচন-ব্যবস্থা নেই। তহশিল অথবা থানা-এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন-পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানরা—তাঁদের পদাধিকারবলেই—এই দ্বিতীয় তলার সদস্য হয়ে যাবেন। আর সদস্য হবেন তাঁরা, তহশিল অথবা থানার উন্নয়ন-কর্মের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা সরকারী কর্মচারী, এবং সরকারই তাঁদের মনোনীত করে পাঠাবেন। তবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, গণতন্ত্রের দোতলাতেও এই মনোনীত সরকারী সদস্যদের সংখ্যা কিছুতেই বেসরকারী সদস্য-সংখ্যার অর্ধেকের বেশী হবে না।

তিনতলায় রয়েছে জেলা-কাউন্সিল। জেলা-কাউন্সিলের সদস্যদের কাজ? জেলার যাবতীয় উন্নয়ন-কর্মের নীতি তাঁরা নির্ধারণ করবেন। আর "এ-ব্যাপারে যেহেতু সরকার আর জনগণের প্রচেষ্টায় একটি সমতা থাকা দরকার," গণতন্ত্রের এই তিনতলায়, সুতরাং, মনোনীত আর নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যানুপাত হবে ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।

চারতলা অথবা ডিভিশন-কাউন্সিলের কাজও, কে না জানে, অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেও, অতএব, ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই হচ্ছে গিয়ে বেসিক ডিমোক্রেসি বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মনোনয়নের ব্যবস্থা যেখানে এত ঢালাও, গণতন্ত্রের চরিত্র সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা। এ-প্রশ্ন অসঙ্গত নয়। সত্যি বলতে কী, চট্টগ্রামের একটি

যুবকের চিত্তেও এই একই প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। কিন্তু আয়ুব তাকে যে কড়া জবাব দিয়েছিলেন, তাতে সে আর পালাবার পথ পায়নি। আয়ুব বলেছিলেন, গণতন্ত্রের নামে "পুরনো আমলের সেই বল্গা-ছেঁড়া মত্ততাকে আমি আর ফিরিয়ে আনতে চাইনে। ফিরিয়ে আমি আনব না।"

কিন্তু না, চট্টগ্রামে এখনও পৌঁছইনি। চট্টগ্রামের কথা পরে হবে। তার আগে বরং স্পেশাল ট্রেনে ফিরে যাওয়া যাক।

সূর্যদেবের নিদ্রা অনেক আগেই ভেঙেছিল। কিন্তু মাঘ মাসের সেই হাড়-কাঁপানো শীতে, অনুমান করি, শয্যাত্যাগে তাঁর উৎসাহ হয়নি। ঢুলু ঢুলু রক্তাভ চোখে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার কুয়াশার কাঁথার তলায় তিনি অদৃশ্য হয়েছিলেন। তবে সে আর কতক্ষণের জন্যে। উত্তরের হাওয়া যখন তাঁর কাঁথাটাকে নিয়েও টানাটানি শুরু করল, তখন আর তাঁর না-উঠে উপায় রইল না।

ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে দেখছিলাম যে, রাত্রির হিমে সারা মাঠ একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে আছে, আর সেই মাঠের থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। বীরভূমের প্রান্তর নয় যে চোখ একেবারে দিগন্তে গিয়ে ঠেকবে। দৃষ্টির পরিধি এখানে সংকীর্ণ। মাঠের পরে মাঠ নয়, মাঠের পরেই গ্রাম। ছোট ছোট গ্রাম। পুকুর, গোলাঘর, আর গাছের সারি। দু-পাঁচ শ মানুষের ছোট এক-একটা সংসার। সকাল হয়েছে, উনুনে আঁচ পড়েছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশে। ট্রেন থেকে যদি নেমে যেতে পারতুম, তবে হয়ত দেখতে পাওয়া যেত যে, গাছের পাতার হিম এখনও শুকয়নি; আম জাম আর হিজলের পাতা থেকে, টিনের চাল থেকে, একটা একটা করে হিমের বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। এবং আমার সন্দেহ নেই যে, কোনোখানে একটা ঢেঁকির শব্দও হয়ত শুনতে পাওয়া যেত।

সন্দেহ নেই, তার কারণ, পুব-বাংলার এই গ্রামগুলি আমার অচেনা নয়, এবং শীতের এই সকালটিও আমার চেনা। আমি জানি যে, সামনের ওই গ্রামে যদি যেতে হয়, তাহলে হয়ত প্রথমেই একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো আমাকে পেরোতে হবে। গ্রামের মানুষরা তাকে 'চাড়' বলে।

সাঁকো পেরিয়ে 'হালোট'। হালোট মানে চওড়া আল। মাঠে এখন ধান নেই। কলই-শাকের সবুজ আনন্দ আর সর্ষেফুলের হলুদ শোভায় মাঠ এখন ভরে আছে। তারই মধ্য দিয়ে চওড়া আলপথ। সেই আলপথ ধরে মিনিট দশেক হাঁটলেই আমি গ্রামের সীমানায় পৌঁছে যাব। গ্রামের বাইরে একটা মঠ হয়ত আছে, কিংবা নেই। তবে, আর একটু ভিতরে একটা লাউমাচা আর সিরিঙ্গে কয়েকটা খেজুর গাছ আছে। সেই গাছের নীচে গোল হয়ে, উন্মুখ হয়ে, বসে আছে গুটিকয়েক ছেলে। গাছী, পশ্চিমবঙ্গে যাকে 'পাশী' বলে, এখন একটার-পর-একটা খেজুর-রসের হাঁড়ি নামিয়ে আনবে। তার বেশির ভাগই সরিয়ে রাখা হবে গুড় বানাবার জন্য। বাকীটা ওই ছেলেদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হবে। পাটকাঠি আর পেঁপের ডাঁটা তারা অনেক আগেই জোগাড় করে রেখেছে। রসের গেলাসে সেই পাড়াগেঁয়ে স্ট্র ডুবিয়ে তারা খড়ের গাদার সিংহাসনে গিয়ে বসবে। বসেই থাকবে—যতক্ষণ না 'বাজান' তাদের অন্য কাজে পাঠায়।

ভাবনায় ছেদ পড়ল, কেননা দূরাগত একটা কোলাহল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ঘড়িতে এখন সাতটা পঁচিশ। আর মিনিট কয়েক বাদেই আমরা ঘোড়াশালে গিয়ে পৌঁছব।

ঘোড়াশালে কোনও মিটিং হবার কথা ছিল না। কথা ছিল, ট্রেন সেখানে মিনিট পাঁচেকের জন্য থামবে, এবং সেই স্বল্প অবসরেই আমাদের ডাইনিং কারে গিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু স্টেশনের চেহারা দেখেই বোঝা গেল যে, প্ল্যানটাকে একটু পালটে না নিয়ে বোধহয় উপায় নেই। লাল-নীল কাগজের শিকলি দিয়ে প্ল্যাটফর্মটিকে অতি মনোরম করে সাজানো হয়েছে। পতাকা উড়ছে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। আর মানুষ। আশপাশের গ্রাম থেকে ঝেঁটিয়ে মানুষ এসেছে। গাড়ি গিয়ে স্টেশনে ঢুকতেই তারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

অনুমান করা শক্ত হল না যে, আয়ুবের এই স্পেশাল ট্রেনটিকে নয়, স্বয়ং আয়ুবকেই তারা একবার দেখতে চায়।

আয়ুব, অতএব, প্ল্যাটফর্মে নেমে এলেন। জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন। কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সবাই তোমরা খেতে-পরতে পাচ্ছ ত? ফসল ভাল হয়েছে ত? জমহুরিয়তের ব্যাপারটা সবাই বুঝে নিয়েছ ত?

যাকে জিজ্ঞেস করলেন, কালো, রোগা, হাফশার্ট-পরা সেই মানুষটির টেরি অতি পরিচ্ছন্ন, জুলপি তৈলসিক্ত এবং চাউনি ঈষৎ চতুর। মনে হল, শহরের কোনও কলে-কারখানায় সে কাজ করত; তাতে সুবিধে না-হওয়ায় আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। কিন্তু মাঝখানে কিছুদিন শহরে থাকবার ফলে এখন গ্রামে যে তার প্রতিপত্তি ঈষৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। গ্রামের লোকেরা এই 'চালাক' মানুষটিকে সমীহ করে চলে। সেই কারণেই তাকে তারা সামনে এগিয়ে দিয়েছে। প্রভাত মুখুজ্যের "মাস্টার মহাশয়" গল্পের নায়ক ব্রজেশ্বরকে আপনাদের মনে আছে ত? ব্যস, ব্যস, তবেই হল। বিবেচনা করে নিন যে, এও একটি ব্রজেশ্বর।

ইংরেজীও প্রায় ব্রজেশ্বরেরই মত। আয়ুবের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, "আমরা ভাল আছি সার্। ভেরি-গুড। আপনাকে দেখবার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। হোল্ নাইট স্ট্যাণ্ডিং। থ্যাংক্ ইউ, সার্।"

আয়ুব হেসে উঠলেন। পাশের অফিসারটির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "এ ভেরি ক্লেভার ম্যান।"

ক্লেভার ম্যানটির লাজুক-লাজুক চাউনি দেখে মনে হল, আয়ুবের এই মন্তব্যে সে খুব খুশী হয়েছে।

ওদিকে হুইশ্ল বাজল। আমরা ট্রেনে গিয়ে উঠলাম।

আনোয়ার আমেদ বললেন, "সফর-সূচী আমি দেখিনি। কতক্ষণ যে এই ট্রেনের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে, আমি জানিনে। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ। ইতিমধ্যে এমন কাউকে দেখছিনে, পরস্পরের সঙ্গে যিনি আমাদের আলাপ করিয়ে দিতে পারেন। অথচ, একই কামরার যাত্রী হয়েও যদি আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা না বলি, ত সে অতি বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। সুতরাং, আর দেরি করে কোনও লাভ নেই, লেট্'স ইন্ট্রোডিউস আওয়ারসেল্ভ্স।"

অমিতাভ, অনিল, সত্যেন আর কহ্লনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে মন অত্যন্তই দমে গিয়েছিল। আনোয়ার আমেদের প্রস্তাবে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। বললাম, "বিলক্ষণ। আমার নাম—।"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আনোয়ার আমেদ বললেন, "যাচ্চলে! আমি কি আপনার নাম জানতে চাইছিলুম? তবে জেনে রাখুন, আপনার নাম কী, এবং কলকাতার কোন্ কাগজকে আপনি রেপ্রেজেণ্ট করেন, তা আমি জানি। জানবার জন্যে বিশেষ তক্‌লিফও আমাকে স্বীকার করতে হয়নি। আপনার বার্থের পাশের ওই লেবেলটাতেই তা অতি স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। এবং আমার এদিককার লেবেলটাতে যদি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, আমার নাম আনোয়ার আমেদ। আমি রেডিয়ো পাকিস্তানের অতি তুচ্ছ একটি কর্মচারী, ইংরিজী বিভাগের নিউজ-এডিটর। না মশায়, নাম-ঠিকানায় আমার দরকার নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আপনার সঙ্গে তেল আছে কিনা।"

"তেল! কিসের তেল?"

"নারকোল-তেল। মাথায় মাখব। তেল না মেখে আমি চান করতে পারিনে। আমি টুথব্রাশ এনেছি, টুথপেস্ট এনেছি, আয়না এনেছি, এক ডজন ব্লেড এনেছি, দুখানা তোয়ালে এনেছি, দেড়

ডজন রুমাল এবং আটটা শার্ট এনেছি ; এমন কি জুতো মুছবার ঝাড়ন পর্যন্ত এনেছি। আপনার যদি দরকার হয়, ধার দেব। এক ওই টুথব্রাশটি ছাড়া। না না, তাও দেব। একটা স্পেয়ার-টুথব্রাশও আমার সঙ্গে আছে। এক্কেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ, মোড়কটা পর্যন্ত খুলিনি। সেইটেই না-হয় দিয়ে দেব আপনাকে। পরিবর্তে, আপনি কি আমাকে একটু নারকোল-তেল দিতে পারবেন?"

বললাম, "পারব।"

আনোয়ার-সাহেব বললেন, "সাবাশ! এইবারে বলুন, আমাদের দেশ আপনার কেমন লাগছে।"

পুব-বাংলা আমার কেমন লাগছে!

বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। অতীত জীবনের যে স্মৃতিটাকে, মারাত্মক যে যন্ত্রণাটাকে এতক্ষণ ভুলে ছিলাম, হাসি-তামাশা আর রঙ্গ-রহস্যের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে আনোয়ার-সাহেব সেই স্মৃতি আর সেই যন্ত্রণাকেই হঠাৎ ছুঁয়ে দিয়েছেন। এবং ছুঁয়ে যে দিয়েছেন, তা তিনি নিজেও হয়ত জানেন না। তা নইলে কি আর এত সহজে, এত অক্লেশে, এত পরিহাসতরল গলায় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, পুব-বাংলা আমার কেমন লাগছে?

পুব-বাংলা আমার কেমন লাগছে! এ কী অদ্ভুত, এ কী নিষ্ঠুর প্রশ্ন! পুব-বাংলায় আমার জন্ম ; আমার সাত পুরুষের ভিটে ছিল এই পুব-বাংলায় ; জীবনের একটা প্রধান অংশ আমার পুব-বাংলায় কেটেছে। কিন্তু তাতে কী। নদীমাতৃক এই দেশ তবু আমার স্বদেশ নয়। আনোয়ার-সাহেবের স্বদেশ। অথচ, আনোয়ার আমেদ পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ। পূর্ববঙ্গের প্রায় কিছুই তিনি চেনেন না। নদীর ধারের ওই গাছটাকে তিনি চেনেন না, গাছের ডালের ওই পাখিটাকেও না। তিনি কি জানেন যে, ওই পাখিটা এক্ষুনি উড়ে যাবে, উড়ে গিয়ে

ওই নদীর উপরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে, ঘুরতে-ঘুরতেই এক সময়ে বিদ্যুদ্বেগে ওই জলের উপরে ছোঁ মারবে, এবং ঠোঁটের মধ্যে ছোট্ট একটা মাছ নিয়ে আবার ডাঙায় ফিরে আসবে? সেই মাছটাকেই কি চিনতে পারবেন আনোয়ার-সাহেব?

আনোয়ার সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে এই পাল্টা-প্রশ্নগুলি আমি ছুঁড়ে দিতে পারতাম। দিলাম না, তার কারণ আমি জানি যে, তাঁর কোনও দোষ নেই। জেনেশুনে তিনি আমাকে দুঃখ দেননি।

না, তা তিনি দেননি।

ম্লান কণ্ঠে তাই বললাম, "আনোয়ার-সাহেব, আপনার জন্ম কোথায় আমি জানিনে। হয়ত সিন্ধুপ্রদেশে, হয়ত পশ্চিম-পাঞ্জাবে। কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, জন্মভূমিকে কেমন লাগে আপনার, ত আপনি কি সেই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারবেন? জবাব হয়? আনোয়ার-সাহেব, পুব-বাংলা আমার জন্মভূমি।"

আনোয়ার আমেদ যে কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। দেখলাম, মুখ নিচু করে তিনি তাঁর আপন বার্থে ফিরে যাচ্ছেন।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। জানালায় মুখ রেখে দেখতে লাগলাম যে, রোদ্দুরের তাপে রাত্রির শিশির ক্রমে শুকিয়ে আসছে, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, এবং দূরের ছবিগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কতক্ষণ যে বসে ছিলাম, আমি জানিনে। আনোয়ার-আমেদের কণ্ঠে আমার চমক ভাঙল। তাঁর ভঙ্গিতে তখন পরিহাস ছিল না, এবং কণ্ঠে ঈষৎ বেদনা ছিল। সিগারেটের টিনটাকে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ধীর শান্ত গলায় তিনি বললেন, "আপনাকে দুঃখ দিয়েছি হয়ত। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, তার জন্যে আমি নিজেও কিছু কম লজ্জিত নই। আর হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমি এখন পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ, কিন্তু জন্ম আমার গয়া জেলায়। বারো বছর

আগে আমি গয়া থেকে চলে এসেছি, এবং এই বারো বচ্ছরের মধ্যে গয়াকে আমি দেখিনি। আবার কখনও দেখব কিনা, আমি জানিনে।”

আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। জানালায় মুখ রেখে নিঃশব্দে আমরা বসে রইলাম।

একে ত প্রেসিডেন্টের স্পেশাল; তার উপরে সেই প্রেসিডেন্টও আবার যে-সে মানুষ নন, জাঁদরেল ফিল্ড-মার্শাল। ঘোড়াশাল আর ভৈরববাজারে যেটুকু দেরি হয়েছিল, দ্রুত চাকায় তাকে মেক-আপ করে নিয়ে আমাদের ট্রেন তাই একেবারে লাফাতে লাফাতে কুমিল্লায় গিয়ে পৌঁছল। (কথাটা আমি বাড়িয়ে বলিনি। সত্যিই আমাদের গাড়িটা ভীষণ লাফাচ্ছিল। আনোয়ার আমেদ বললেন, মিটারগেজের গাড়ি, এই উল্লম্ফনকে তাই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই বিবেচনা করতে হবে।) ঘড়িতে তখন দশটা পঁয়তাল্লিশ। ইতিমধ্যে চা খেয়েছি, স্নান করেছি, যে যার ডেসপ্যাচের একটা খসড়া করে ফেলেছি, ট্রেনের প্রেস-রুমে একবার চক্কর দিয়ে এসেছি, টেলিগ্রাম আর রেডিয়ো-ফোনের ব্যবস্থাটাকে ঠিকমত বুঝে নিয়েছি, এবং—হাতে যেহেতু আর অন্য কোনও কাজ ছিল না—এনায়েতুল্লার কণ্ঠে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতও শ্রবণ করেছি। এনায়েত অতি চমৎকার ছেলে। বয়স বড়জোর কুড়ি কিংবা একুশ। মেরেকেটে বাইশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়তে পড়তেই পত্রিকায় চাকরি নিয়েছে। এনায়েত এখন পাকিস্তান অবজার্ভারের জুনিয়র রিপোর্টার। কর্মস্থলে ইতিমধ্যে কিছু সুনামও তার হয়ে থাকবে। নইলে কি আর এত অল্প বয়সেই তাকে বাইরে পাঠানো হত? তা সে যা-ই হক, আমি কিন্তু ঠিক সেইজন্য তাকে 'চমৎকার' বলিনি। আসলে তার গানের গলা অতি চমৎকার। একে সুরেলা, তায় জোরালো। তার চাইতেও প্রশংসার কথা, শ্রোতাকে কৃতার্থ করবার জন্যে সে গান গায় না। গান গায় তার আপন গরজে। তখন মনে হয়, নিজের একটা দৈব আকাঙ্ক্ষাকেই সে যেন তার গানের মধ্যে দিয়ে মুক্তি দিতে চাইছে।

এনায়েত গান গাইছিল। গানে ছেদ পড়ল ওসমানীর কথায়। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে এতক্ষণ নিসর্গ-শোভা অবলোকন করছিল। ট্রেনের গতি ঈষৎ মন্দীভূত হতেই ঘোষণা করল, "কুমিল্লা এসে গিয়েছে। আমাদের নামতে হবে।"

এনায়েত বলল, "তৈরী হয়ে নিন, দাদা।"

তৈরা হতে ঠিক দু মিনিট লাগল। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে গিয়ে দেখি, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশন থেকে আমাদের সভাস্থলে নিয়ে যাবে। তারই একটাতে গিয়ে উঠে পড়লাম। এবং উঠেই আবিষ্কার করলাম যে, কহ্লন আমার আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। আমাকে দেখে বলল, "এই যে, এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।"

সত্যিই অপেক্ষা করছিল কিনা, আমি জানিনে। কিন্তু এতই আগ্রহভরে বলল যে, অবিশ্বাস করাও সম্ভব হল না।

কুমিল্লার জনসভায় সেদিন বিস্তর লোক জমেছিল। মহারাজা বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরির সামনে মস্ত বড় মাঠ। সেই মাঠে সেদিন তিলধারণের জায়গা ছিল না; এবং মাঠের আশে-পাশে, প্রতিটি গৃহশীর্ষে আর অলিন্দেও সেদিন জন-সমাবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। একটি বাড়িই শুধু শূন্য। লাইব্রেরি-ভবনের হাতায় একটি ছোট্ট একতলা বাড়ি। তার দেয়ালের গায়ে অতি স্পষ্টাক্ষরে এখনও লেখা রয়েছে—"ধর্মমন্দির ঃ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।"

আয়ুব সেদিন উর্দুতে বক্তৃতা দিলেন। উর্দু অবশ্যই বিসর্গবহুল ভাষা নয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, ও-ভাষার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিনে। শুধু মাঝে মাঝে এক-একবার তমদ্দুন্, কৌশিস, মজবুর, ইন্তেজার, তংদস্তি, বরদাশ্‌ত্ ইত্যাদি সব শব্দ শুনে

আমার মনে হচ্ছিল যে, যে-বক্তৃতার শব্দাবলী এত গুরুভার, তার বিষয়বস্তুও হয়ত কম গুরুত্বপূর্ণ হবে না। বক্তৃতা শেষ হবার পর কহ্লনকে তাই বললাম, "ভাই, তুমি ত সবই বুঝতে পেরেছ। এখন ট্রেনে ফিরে গিয়ে, অজ্ঞজনের সুবিধার্থে এই বক্তৃতার একটি ইংরিজী অনুবাদ যদি আমাকে শুনিয়ে দাও ত বড় উপকৃত হব।"

কহ্লন বলল, "আরে ন্নাঃ, তেমন কিছু বলেননি।"

তেমন কিছু অবশ্য পরবর্তী সভাতেও শোনা গেল না। পরবর্তী সভায় মানে প্রশ্নোত্তর-সভায়, লাইব্রেরি-ভবনের অন্দরে যার আয়োজন করা হয়েছিল। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের জনাকয়েক নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কুমিল্লা শহরের জনাকয়েক মান্যগণ্য ব্যক্তি সেখানে আয়ুবকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন করলেন তরুণী একটি মেয়েও। মেয়েটির শাড়ির উপরে একটি বুরখা ছিল বটে, কিন্তু তাঁর মুখশ্রী তাতে আবৃত ছিল না। এই মেয়েটির প্রশ্নেই যা-কিছু তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রেসিডেণ্টকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে মেয়েদের জন্যে পৃথক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই কেন। আয়ুব তার উত্তরে যখন এইরকমের একটা মন্তব্য করলেন যে, মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু, এবং পৃথক আসনের দাবি না জানিয়ে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই তাঁদের কর্তব্য, প্রশ্নকর্ত্রী তাতে বিন্দুমাত্র দমে গেলেন না। বললেন, "মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, সার্, আপনি অতি সঙ্গত কথাই বলেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, নির্বাচনের দ্বন্দ্বে পুরুষদের সঙ্গে এঁটে ওঠা বড় শক্ত। মেয়েদের চাইতে, অন্তত এই একটা ব্যাপারে, তারা অনেক বেশী সেয়ানা।"

জবাব শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন আয়ুব। সাংবাদিকরাও খুশী হলেন। হয়ত এই ভেবে যে, নানাবিধ গুরুগম্ভীর বিষয়াদির মধ্যে আপনাপন কাগজকে তাঁরা এবারে দিব্য একটি বক্স-আইটেম পাঠাতে

পারবেন। সঠিক জানিনে, শুধু অনুমান করতে পারি যে. “আয়ুব আউটউইটেড” অথবা “ইয়াং লেডি ড্রজ আয়ুব্'স লাফ্টার” অথবা ওই ধরনের অন্য কোনও হেডিংও হয়ত তাঁদের মনশ্চক্ষে এসে ভেসে উঠেছিল।

ফিরতি পথে কহ্লন বলল, “কুমিল্লা নামটা আমার চেনা। মনে হচ্ছে, গুটিকয়েক ব্যাঙ্কের সঙ্গে যেন একদা এই নামটিকে আমি জড়িত থাকতে দেখেছি।”

বললাম, “ঠিকই মনে হচ্ছে। কুমিল্লার খ্যাতি প্রধানত দুটি কারণে। ব্যাঙ্কস্ অ্যাণ্ড ট্যাঙ্কস্। কুমিল্লার ব্যাঙ্ক তুমি দেখেছ, কিন্তু দিঘি দেখনি। সময় থাকলে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া যেত।”

কহ্লন বলল, “হুম্। তোমার গলায় ঈষৎ গর্বের ছোঁয়া লেগেছে। তুমি কি কুমিল্লার লোক?”

বললাম, “না। কিন্তু কুমিল্লাকে নিয়ে সত্যি গর্ব করা চলে। অন্তত এই কারণে যে, বাণিজ্য আর সংস্কৃতি—আপাতবিরোধী এই দুটি বস্তুর মধ্যে এখানে সেতুবন্ধন সম্ভব হয়েছিল। ব্যাঙ্কের কথা শুনেছ। এখন জেনে রাখো যে, সংস্কৃতির সাধনাতেও কুমিল্লাবাসীদের আগ্রহ নেহাত অল্প ছিল না।”

কহ্লন বলল, “তুমি কি সেই বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা বলছ, কুমিল্লা শহরের কাছে, মাটির তলায়, যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?”

সবিনয়ে বললাম, “না। আমার বিদ্যে শতকের নয়, দশকের। নিতান্তই দু-তিন দশক আগের কথা বলছি। বাণিজ্যের সঙ্গে সাহিত্যের চর্চাও তখন এখানে সমান উৎসাহ পেয়েছে।”

কহ্লন বলল, “তুমি ভাব, আমি বাংলা জানিনে। কিন্তু বাংলা

আমি জানি। আমি টেগোর পড়েছি। টেগোরের একটি কবিতায় আছে—'বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে লক্ষ্মী সরস্বতী।' কুমিল্লার প্রসঙ্গে কি এই কথাটা আমি প্রয়োগ করতে পারি?"

বললাম, "পার। তবে না-করলেই ভাল। তার কারণ, সেই মালাটা হয়ত ছিঁড়ে গিয়েছে।"

কুমিল্লা থেকে ফেনি। পৌঁছতে প্রায় আড়াইটে বাজল। প্ল্যাটফর্মের উপরেই সভামঞ্চ সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। দৌড়ঝাঁপের কোনও দরকারই সুতরাং ছিল না। যদি ইচ্ছে হত, ট্রেনের মধ্যে যে-যার আপন বিছানায় বসেই আমরা বক্তৃতার নোট নিতে পারতুম। তা অবশ্য কেউ নেইনি। মঞ্চটিকে আটচালার আকারে এত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল যে, আর একটু কাছে গিয়ে তাকে না-দেখলে আমাদের অন্যায় হত। কাছে গিয়ে দেখি, আটচালার সিলিং থেকে শিকে ঝুলছে দু-পাঁচটা। তার কোনওটায় বা কেরোসিন-তেলের বোতল, কোনওটায় বা আচারের বোয়ম। তা ছাড়া বেড়ার গায়ে আবার ধানের ছড়াও গুঁজে রাখা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, মঞ্চ নয়, সম্পন্ন কোনও চাষী গৃহস্থের বাড়ি।

ফেনিতে ছিল প্রশ্নোত্তর-সভা। জিরাটিয়া প্রজাদের স্বত্ব নিয়ে সেখানে প্রশ্ন উঠেছিল। আয়ুব জানালেন, এ নিয়ে অকারণে উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই। ভারতবর্ষের সঙ্গে নানা ব্যাপারেই ত আলোচনা চলছে। সুতরাং ধৈর্য ধরাই ভাল।

প্রশ্ন উঠেছিল কমনওয়েলথ-প্রধানমন্ত্রী-সম্মেলন সম্পর্কেও। প্রেসিডেন্টের কি তাতে যোগ দেওয়া উচিত হবে? আয়ুব বললেন, নয় কেন? তিনি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নন, তাই? কিন্তু তাতে কী। এমন দেশও অনেক আছে, প্রেসিডেন্টকেই যেখানে প্রধানমন্ত্রীর

কাজ চালাতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি পাকিস্তানের একটি বন্ধু-রাষ্ট্রের উল্লেখ করলেন, এবং বললেন যে, এ নিয়ে কোনও আপত্তি তুলবার অর্থ হয় না।

প্রশ্নোত্তর-পর্ব সাঙ্গ হবার পর জনৈক পক্ককেশ দীর্ঘশ্মশ্রু ব্যক্তি—নিজেকে তিনি খাকসার বলে বর্ণনা করেছিলেন—পদ্যাকার একটি প্রশস্তি পাঠ করলেন। আয়ুবের প্রশস্তি। তার শেষের পংক্তিটা এখনও ভুলে যাইনি। "লং লিভ্ করো আল্লা ধর্ম আয়ুব খানে।"

পাঠক অবশ্যই পাহাড়তলির নাম শুনেছেন; তার কারণ, চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাসও তাঁর অশ্রুত নয়। চট্টগ্রামের একটু আগেই পাহাড়তলি। বড় সুন্দর, বড় মনোরম জায়গা। দু-চোখ মেলে তার রম্য শোভাকে ধীরে-সুস্থে, তারিয়ে তারিয়ে, উপভোগ করতে করতে গাড়ি গিয়ে চট্টগ্রামে ঢুকল। শীতের সন্ধ্যা। শহরে তখন আলো জ্বলে উঠেছে।

কুরেশি-সাহেব জানিয়ে দিলেন, "আজ আর কোনও কাজ নেই। দি ইভ্নিং ইজ ফ্রী।"

গুটিকয়েক সাইকেল-রিকশা জুটিয়ে নিয়ে, প্রায় তন্মুহূর্তেই, আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম।

অনেক কাল আগেকার গান, কিন্তু তার প্রথম লাইনটি আজও স্পষ্ট মনে আছে। "স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা, জাগিয়ো না আমায় জাগিয়ো না।" এ অতি সঙ্গত অনুরোধ, তাতে সন্দেহ করিনে; শুধু এই সঙ্গে আমার একটি সাপ্লিমেণ্টারি প্রস্তাব আছে। নিদ্রিত ব্যক্তির পেশা যদি হয় সাংবাদিকতা, তবে তাঁর স্বপ্নটা অতি ভয়ঙ্কর হলেও তাঁকে জাগিয়ো না। এ-কথা বলবার কারণ এই যে, জেগে উঠলে তাঁকে হয়ত আরও মারাত্মক, আরও সাংঘাতিক কোনও দুঃস্বপ্নের খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে।

এই হতভাগ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ট্রেনের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে আমি ঘুমোচ্ছিলাম, এবং স্বপ্ন দেখছিলাম যে, তিনটে ডাকাত আমাকে তাড়া করেছে। এমন সময়ে আমাকে জাগিয়ে দেওয়া হল। জেগে উঠে দেখি, সর্বনাশ, ডাকাতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে একটি বাঘের খপ্পরে গিয়ে পড়েছি। মতিন।

পূর্ববঙ্গ সরকারের জনসংযোগ-দপ্তরের এই তরুণ অফিসারটির পুরো নাম আমি জানিনে; জানবার কোনও প্রয়োজনও হয়নি। শুধু একবার "মতিন" বলে হাঁক দিলেই তাকে হাতের নাগালে পাওয়া যেত। এমনিতে অতি হাসিখুশী ছেলে; চর্কির মতন ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, হাসছে, গল্প করছে, পানটা-সিগারেটটা এগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তার অন্য মূর্তি। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। তাকে দেখবামাত্র আমি বুঝতে পারলাম যে, মতিন আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছে।

চোখ পাকিয়ে বলল, "কী কাণ্ড বলুন ত, দাদা! সাড়ে ছটা বাজে, সাতটার মধ্যে গবনমেণ্ট-হাউসে যেতে হবে, সেখানে প্রেস-

কনফারেন্স আছে। আর আপনি কিনা অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছেন।"

সত্যি কথাই বলব, মতিনকে আর আজ আমার ভয় পাবার কোনও কারণ ছিল না। বললাম, "মতিন, আমার ধারণা তুমি একটি বাঘ। কিন্তু অনিল বলে, তুমি একটি বিচ্ছু। বাঘই হও আর বিচ্ছুও হও, ডাকাতের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তার জন্যে ধন্যবাদ।"

মতিন বলল, "ডাকাত! তার মানে?"

বললাম, "মানে তুমি বুঝবে না। শুধু জেনে রাখো যে, আজ আর তোমাকে ভয় পাচ্ছিনে। ইচ্ছে করলে আমি আরও মিনিট দশেক ঘুমিয়ে নিতে পারি।"

"তার মানে?"

"মানে অতি প্রাঞ্জল। আমি জানতুম যে, সাত-সকালেই তোমার হামলা শুরু হবে। অথচ প্রাতরুত্থানে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। কাল রাত্তিরেই তাই আমি স্নান করে দাড়ি কামিয়ে নিয়েছি। আমার তৈরি হতে, অতএব, পাঁচ মিনিটও লাগবে না।"

মতিনের চক্ষু প্রায় কপালে উঠে গিয়েছিল। আমতা-আমতা করে বলল, "রাত্তিরেই স্নান করেছেন? এই মাঘের রাত্তিরে?"

বললাম, "হ্যাঁ হে ব্রাদার। এবং এ শুধু একদিনের ব্যাপার নয়। এখন থেকে আমি রাত্তিরেই স্নান করব। নয়ত অতি সকাল-সকাল উঠতে হয়। তাতে আমার রুচি নেই। সকালে নিদ্রাভঙ্গ মানে অকালে নিদ্রাভঙ্গ। এবং অকালে নিদ্রাভঙ্গর পরিণাম কদাচ ভাল হয় না। তুমি রামায়ণ পড়েছ?"

"না।"

"ব্যস, তবে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। এখন চল কোথায় যেতে হবে।"

ইংরেজী প্রবাদে বলে, ভগবান গ্রাম বানিয়েছেন, আর মানুষ বানিয়েছে শহর। এ-কথা সর্বত্র খাটে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর অসংখ্য গ্রাম সম্পর্কে খাটে না; আবার প্রাচ্য পৃথিবীর কয়েকটি শহর সম্পর্কেও খাটে না। খাটে না চট্টগ্রামের সম্পর্কেও। চট্টগ্রাম শহরের ঘরবাড়ি আর কল-কারখানা অবশ্য মানুষেরই বানানো। কিন্তু তাতে কী, সেই ইঁটকাঠের ঘরবাড়ি আর শান-বাঁধানো কারখানার মধ্যেই মানুষের দৃষ্টি যাতে না আটকে থাকে, বিধাতা তার জন্যে যেন অনেক আগেই তাঁর আপন হাতে এই জায়গাটিকে এসে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তার পায়ের তলায় তিনি একটি সমুদ্র দিয়েছেন, শিয়রে গুটিকয়েক পাহাড় দিয়েছেন, বুকের পাশে একটি নদী দিয়েছেন। তাতেও যেন তাঁর সাধ মেটেনি। সাদা-খোল সেই নদীর শাড়ির দুপাশে আবার তাই ঘন অরণ্যের দুটি সবুজ পাড়ও তিনি বুনে দিয়েছেন। আর, বিধাতার সেই আপন হাতের শিল্পকর্মের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছে বলেই যে মানুষের শিল্পকর্মও এখানে একটি শান্ত শোভা ধারণ করেছে, তাতেও আমার সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রামের গবর্নমেণ্ট হাউসকেও হয়ত এই কারণেই আমার এত ভাল লেগে থাকবে। নেহাতই সাদামাটা বাড়ি, সামনে একটা মস্ত বড় বাগান পর্যন্ত নেই। অথচ, ঢেউ-খেলানো জমির প্রান্তে ছোট্ট একটা টিলার উপরে সেই নিরাভরণ বাড়িটাকেই যেন একটা ছবির মতন দেখাচ্ছিল। আমরা যখন পৌঁছলাম, অফিসাররা তার অনেক আগেই এসে জমায়েত হয়েছেন। তবে আয়ুব তখনও নামেননি।

আয়ুব নামলেন স-সাতটায়। অফিসারদের ব্যূহ ভেদ করে সাংবাদিকদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কী, কোনও প্রশ্ন আছে নাকি?

তা-ই আবার না থাকে! সাংবাদিকরা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ প্রশ্নও থাকবে। প্রথমে যিনি প্রশ্ন করলেন, এর আগে আর কখনও তাঁকে আমি দেখিনি। ভদ্রমহিলা অবাঙালী। পরনে একখানি নীল রেশমের শাড়ি, দুই কানে নীল পাথরের কর্ণাভরণ। নাম বেগম আলি খাঁ; চট্টগ্রামের দৈনিক পত্র ঈস্টার্ণ একজামিনারের তিনি সম্পাদিকা। তাঁর প্রশ্ন ছিল, জিনিসপত্রের দাম এত চড়ে যাচ্ছে কেন? কাপড়ের দাম চড়ে গিয়েছে, চায়ের দামও গগনচুম্বী। এই অবস্থায় কি কিছু একটা করা উচিত নয়?

বস্ত্রমূল্যের প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে গেলেন আয়ুব। চায়ের সম্পর্কে বললেন, "এই ড্যাম্ড বস্তুর নেশাটা আর না-বাড়াই ভাল।"

আয়ুবের জবাবের মধ্যে কি ঈষৎ অসহিষ্ণুতা ছিল? জানিনে। মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গটা কি তাঁর ভাল লাগেনি? সম্ভবত। আমার মনে হয়েছিল, প্রসঙ্গটার তিনি পাশ কাটিয়ে গেলেন। না-গেলেই অবশ্য ভাল হত। তার কারণ, মার্শাল লয়ের কড়াকড়ির মধ্যেও, এই মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপার নিয়ে পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় সম্প্রতি একটি ঝাঁঝালো সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

পরের প্রশ্নটা আরও অস্বস্তিকর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান আজ বিপজ্জালে বেষ্টিত। এ-কথা বলে কার কথা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন? ভারতবর্ষের? না চীনের?

স্পষ্ট দেখলাম, আয়ুবের ভ্রুযুগল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে এসেছে। তন্মুহূর্তেই এই প্রশ্নের তিনি জবাব দিলেন না। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দকে ওজন করে নিয়ে, বললেন, "পাকিস্তানের প্রতি যারা বন্ধুভাবাপন্ন নয়, তাদের সকলের কথাই আমি বোঝাতে চেয়েছি।"

এ-উত্তর আরও অস্পষ্ট। মনে হল, আজ আর কোনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে না।

সভা ভাঙল আটটায়। প্রায় তদ্দণ্ডেই আমরা, সারি সারি গাড়ি এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল, রাঙামাটির পথে রওনা হলাম।

তাড়াহুড়োর মাথায় কে যে কোথায় উঠে পড়েছি, খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল, যখন দেখলাম, আমার ঠিক পাশেই বসে আছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার ঢাকা-করেসপণ্ডেন্ট। অথচ, তাঁর সঙ্গে ত আমি এক গাড়িতে আসিনি। কাতর কণ্ঠে বললাম, "বিশ্বজিৎদা, আমি ভুল-গাড়িতে উঠেছি, আমাকে নামিয়ে দিন। আমার সঙ্গীরা আমার জন্মে বসে থাকবে হয়ত।"

বিশ্বজিৎদা অতি মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, "কেউই বসে থাকবে না ভাই। আর তা ছাড়া নামিয়ে দিতে যে বলছ, নামাবার মালিক কি আমি?"

সবিস্ময়ে বললাম, "সে কী! এ-গাড়ি আপনাদের নয়?"

বিশ্বজিৎদা বললেন, "না, ভাই। আমার অবস্থা তোমার সম। আমিও ভুল-গাড়িতে উঠেছি।"

এ তবে কাদের গাড়িতে উঠলাম আমরা! তখন তাকিয়ে দেখি, আমাদের একেবারে সামনের আসনেই মস্ত তিন কবি বসে আছেন। জসিমউদ্দিন, গোলাম মোস্তফা আর ফররুখ আমেদ।

ফররুখ সাহেব আমার অস্বস্তিটা হয়ত টের পেয়ে থাকবেন। পিছন ফিরে বললেন, "এ-গাড়ি এখানকার লেখকদের জন্মে রিজার্ভ্‌ড। কিন্তু তাতে আপনার অস্বস্তিবোধের কোনও হেতু নেই। পশ্চিমবঙ্গের একটি লেখককেও আমরা জায়গা দিতে পারব। কী বলেন জসিম-সাব, পারব না?"

জসিমউদ্দিন বললেন, "পারব, যদি একটি সিগারেট পাই। আমার প্যাকেট একেবারে শূন্য।"

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললাম, "বাঁচা গেল!"

চট্টগ্রাম থেকে রাঙামাটি। প্রায় সত্তর মাইল পথ। সেই পথের দু-দিককার দৃশ্য অতি মনোরম। কোথাও-বা সমতল জমি, কোথাও বা পাহাড়। পাহাড়ের ধারেই দু-চারটে বাড়ি। একটা বা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে বেঞ্চি পাতা। মানুষ-জন বসে আছে, চা খাচ্ছে, গল্প করছে। আর সেই দৃশ্যাবলীকে দু দিকে ফেলে রেখেই ছুটছে আমাদের গাড়ি। ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। মনে হচ্ছিল, পথ নয়, দীর্ঘ একগাছি সুতো। ঘুড়ি কাটা যাবার পর শূন্য থেকে সেই সুতোটা যেন মাটির উপরে মুখ থুবড়ে পড়েছে, আর—পাছে কোনও দুষ্টু ছেলে সেই সুতোটাকে হঠাৎ ধরে ফেলে—দ্রুত হাতে লাটাই ঘুরিয়ে তাকে আমরা ফের গুটিয়ে নিচ্ছি।

কিন্তু পথের শোভায় মুগ্ধ হব, এমন উপায় ছিল না। তার কারণ ধুলো উড়ছিল। রাঙা ফিনফিনে ধুলোর ঝড়। জানালার কাঁচ তুলে দিলাম। কিন্তু ধুলোর অত্যাচার তবু ঠেকানো গেল না। ধুলো, ধুলো, ধুলো। সারা গাড়ি ধুলোয় ভরে উঠল। সাড়ে দশটা নাগাদ যখন রাঙামাটিতে গিয়ে পৌঁছলাম, শুধু জামাকাপড় নয়, আমাদের চুল পর্যন্ত তখন রাঙা হয়ে গিয়েছে।

রাঙামাটিতে নামলাম বটে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সদর-শহর (রাঙামাটিকে যদি শহর বলা যায়!) আমাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল আরও মাইল তিনেক দূরের সেই ফাঁকা অঞ্চলটি, অনতিকালের মধ্যেই যেখানে একটি নতুন বসতি—নয়া রাঙামাটি—গড়ে উঠবে। গড়ে তুলবার কারণ, কর্ণফুলি প্রজেক্টের প্রয়োজনে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল

জলমগ্ন হবে, তার অধিবাসীদের—চাকমাদের—পুনর্বাসনের জন্যে একটা জায়গা চাই।

নয়া-রাঙামাটির ভিত্তি স্থাপন করলেন আয়ুব। এই উপলক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাস্থলে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল। তারপর বক্তৃতা।

আয়ুবের বক্তৃতার মস্ত গুণ, বক্তৃতাটা মস্ত হয় না। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি বললেন, পূর্বপাকিস্তানে যেহেতু বিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপায় অত্যন্তই সীমাবদ্ধ, কর্ণফুলি জল-বিদ্যুৎপরিকল্পনাকে, অতএব, উপেক্ষা করবার উপায় নেই। কিছু মানুষের সাময়িক কিছু ক্ষতি তার ফলে হবে বটে, কিন্তু তার জন্যে যেন কেউ চিন্তিত না হয়, কেননা ক্ষতিপূরণে কোনও কার্পণ্য এক্ষেত্রে করা হবে না।

বক্তৃতা শেষ হল। হাততালি পড়ল। আমরা আমাদের গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

রাঙামাটি থেকে কাপতাই। আবার সেই ধূলিধূসর পথ। রক্ষা এই যে, পথটা এবারে সত্তর মাইল দীর্ঘ নয়।

কর্ণফুলি নদীর তীরে, প্রকৃতি দেবীর একেবারে খাসমহলের মধ্যে, যেন একখানি ছবির মতন শহর, এই কাপতাই। ছবির মতন শহর, কিন্তু স্থায়ী শহর নয়। বড় অল্প এর আয়ু। কর্ণফুলি প্রজেক্টের প্রয়োজনে একে গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন আমাদের মাইথন আর পাঞ্চেতকে গড়ে তোলা হয়েছে। বাঁধের কাজ শেষ হলেই প্রয়োজন ফুরোবে কাপতাই শহরের। বাঁধের শুরু হলেই তার সারা হবে। এই বাড়ি, এই বাগান, বিদেশী এঞ্জিনীয়রদের উচ্চালাপে মুখর এই আবহাওয়া আর তখন থাকবে না।

কাপতাইকে আমার দুটি কারণে মনে আছে। এক, তার

সৌন্দর্যের জন্যে। দুই, ব্রিগেডিয়ার এফ. আর. খানের জন্যে। রেস্ট-হাউসে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ঢুকে দেখি, স্বাস্থ্যোচ্ছল দীর্ঘ একটি মানুষ, গুটিকয়েক তরুণ অফিসারকে তিনি সমানে ধমকাচ্ছেন।

"খবর্দার! বিদেশী অতিথিদের আগে যদি কেউ খাবার ঘরে ঢোকে, তবে—তবে আই শ্যাল চিউ হিজ হেড। ইয়েস, চিউ!"

ধমক ত নয়, হুংকার। বাঘের হুংকার। ভদ্রলোকের পরনে অবশ্য সিবিলিয়ান স্যুট, কিন্তু ওই হুংকার শুনে আমার মনে হল, এককালে ইনি খাকি পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন।

পাশের ভদ্রলোক বললেন, "ব্রিগেডিয়ার এফ. আর. খান। ডিরেক্টর অব দি ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্‌স্ট্রাকশন। বয়স বেশী নয়, কিন্তু প্রতাপ অসামান্য।"

"প্রতাপের হেতু?"

"একটা হেতু এই যে, উনি কর্মদক্ষ মানুষ। আর দ্বিতীয় হেতু, ইফ হি ওয়ান্টস টু বি নাস্টি, হি ক্যান বি ভেরি ভেরি নাস্টি।"

বুফে-লাঞ্চের পর্ব চুকতে প্রায় দুটো বাজল। শীতের সূর্য তখন পশ্চিমে গড়িয়ে গিয়েছে। সাংবাদিকরা সবাই এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। কেউ-বা গিয়েছেন সিগারেটের সন্ধানে, কেউ-বা নদী-তীরে। অমিতাভ, কহ্লন, উইলসন আর বার্নহাইমও দুটো জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একদল যাবে ড্যাম-সাইটে; অন্যদল চাকমা-গ্রামে। আমি আর পেরে উঠছিলাম না। একটু আগেই আর-একবার স্নান করে নিয়েছি। দু চোখ তাই ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

হয়ত ঘুমিয়েও পড়তাম। এনায়েত এসে উঠিয়ে দিল। বলল, "মুসায়েরা হচ্ছে। শুনবেন ?"

নিশ্চয়ই শুনব। পুবের বারান্দায় গিয়ে দেখি, আসর বসে গিয়েছে। এদিকে আছেন জসিমউদ্দিন আর গোলাম মোস্তফা। ওদিকে—অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে—জামিরুদ্দিন আলি আর হাফিজ জলন্ধরী। জসিমউদ্দিন একটি পল্লীকাব্য গাইলেন। তারপর জামিরুদ্দিন আর গোলাম মোস্তফার পালা। সবশেষে জলন্ধরী। হাফিজ জলন্ধরী বিখ্যাত কবি। তাঁর নাম আপনারা শুনে থাকবেন। ভদ্রলোক এখন প্রায়-বৃদ্ধ। কিন্তু তাতে কী, তাঁর গলার জোর এখনও কমেনি। স্বরগ্রামের সিঁড়ি বেয়ে এত দ্রুত এবং এত অনায়াসে তিনি ওঠানামা করছিলেন যে, বিস্ময় না-মেনে উপায় ছিল না। মিঠে মেজাজের গুটি দুয়েক কবিতা শুনিয়ে তারপর তিনি তাঁর আসল খেলা শুরু করলেন। গাইতে লাগলেন খাইবার গিরিবর্ত্ম সম্পর্কে তাঁর সেই সুদীর্ঘ কবিতাটি, রৌদ্ররসের পাশাপাশি এক আশ্চর্য বেদনার লাবণ্যও যাকে আপ্লুত করে রেখেছে। গাইতে গাইতে, কবিতার একেবারে প্রান্তে পৌঁছে, সমের মাথায় এক মুহূর্তের জন্যে একবার দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার সুরটাকে অল্প-একটু খেলিয়ে নিয়ে তিনি যখন চুপ করলেন, সকলেই তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসে আছেন। সকলেই তখন বুঝতে পেরেছেন যে, এইটেই শেষ গান ; এরপর আর কোনও গানই জমবে না, জমা সম্ভব নয়।

* * *

শীতের রাত্রি। হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটছে আমাদের। রাত ন-টার আগেই চট্টগ্রামে পৌঁছতে হবে। চুপ করে আমরা বসে ছিলাম। আমি, কুরেশি-সাহেব, মতিন আর কহ্লন। দিনটা বড় সুন্দর কেটেছে। তারই স্মৃতি হয়ত আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এনায়েত গান গাইছিল। "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা··· ।"

বসুন্ধরাকে বড় ভাল লাগছিল।

চব্বিশে জানুয়ারি। দিনের প্রথমার্ধে কোনও অফিশিয়ল এনগেজমেন্ট ছিল না। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে তাই প্রায় আটটা বাজল। তারপর দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, ধুতির মধ্য থেকে ট্রাউজার্সের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় নটা। আনোয়ার আমেদ, ওসমানী আর এনায়েতুল্লা ইতিমধ্যে কামরা থেকে নেমে গিয়েছিলেন। কোথায় গিয়েছিলেন, আমি জানিনে। হয়ত প্রেস-রুমে। হয়ত খানাঘরে। আমার কোনও তাড়া ছিল না। নিরিবিলি একটি সিগারেট ধরিয়ে, বালিশটাকে কোলের উপরে টেনে নিয়ে তাই জানালার ধারে গিয়ে বসলাম।

অমিতাভ এল সাড়ে-নটায়। বলল, "ব্যাপার কী? বিবর থেকে আজ আর বেরুবে না?"

বললাম, "বেরুব না, না-বেরুলে যদি চলে।"

"অর্থাৎ?"

"মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।"

একগাল হাসল অমিতাভ। তারপর বলল, "যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করছি। খানাঘরে চল।"

খানাঘর দোতলায়। রেলওয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে, ওদিককার প্ল্যাটফর্মে নেমে, স্টেশনের দোতলায় উঠছি, হঠাৎ মনে হল, আবহাওয়াটা ঠিক স্বচ্ছন্দ নয়। কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনায় সবাই ছটফট করছে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এক

সাংবাদিক। আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "শুনেছেন ?"

"কী শুনব ?"

"উইলসন বিয়ে করেছে।"

যা-ব্বাবা ! এর মধ্যে আবার শোনাশুনির কী আছে। সিংহলী সাংবাদিক উইলসনের বয়স অবশ্য বেশী নয়। কিন্তু সে যে বিবাহিত—শুধুই বিবাহিত নয়, দারুণ বিবাহিত—তা ত সকলেই জানে। শুনেছি, প্রত্যেক রাত্রেই সে চিঠি লিখতে বসে, এবং সে-চিঠির দৈর্ঘ্য কদাচ পাঁচ পৃষ্ঠার কম হয় না।

অনুমান করতে পারতাম, স্ত্রীর সঙ্গে তার এই প্রথম বিচ্ছেদ, এবং বুঝতে পারতাম যে, মাত্র একদিনের জন্যেও দেশে না-থাকা যার পক্ষে এখন ক্লেশে থাকার সামিল, সপ্তাহব্যাপী এই সফর সাঙ্গ হবার পর প্রথম প্লেনেই সে দেশে ফিরবে। তার আগে প্রত্যহই যে সে পাঁচ-পৃষ্ঠাব্যাপী এক-একখানি পত্রসাহিত্য রচনা করে যাবে, তাতেও কারও কোনও সন্দেহ ছিল না।

উইলসনের বিবাহ-বার্তায়, সুতরাং, বিস্ময়ের কী থাকতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক-বন্ধুটিকেও আমি সেই কথাই বললাম। বললাম "এ ত পুরনো খবর। ডু ডাজ্‌ন্'ট্ নো হী ইজ এ থরোলি ম্যারেড ম্যান ?"

শুনে তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "ওয়েল, আই ডোন্ট্ মীন্ ছাট ম্যারেজ।"

'ছাট' কথাটার উপর এমন অস্বাভাবিক জোর পড়ল যে, বুঝতে পারলাম, আমার হিসেবে কোথাও ভুল হয়েছে।

আমতা-আমতা করে বললাম, "ব্যাপারটা আমি ঠিক ধরতে পারছিনে।"

"আমিই কি পেরেছিলাম?" সংবাদদাতা প্রায় হতাশ কণ্ঠে জানালেন, "লাস্ট নাইট হী ম্যারেড এ চাক্‌মা গার্ল।"

খানাঘরে ঢুকে দেখি, প্রতিটি টেবিলেই এক-একটা মিটিং বসে গিয়েছে। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা। উইলসন।

টুকরো-টুকরো সেই কথাগুলিকে জোড়া দিতে-দিতে শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াল, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই। গতকল্য অপরাহ্নে আমরা যখন মুশায়েরা শুনছিলাম, উইলসন তখন কাপতাইয়ের এক চাকমা-গ্রামে যায়। সেখানে একটি চাকমা মেয়ে নাকি তাকে দেখবামাত্রই সিদ্ধান্ত করে যে, উইলসন ছাড়া আর কাউকেই সে বিয়ে করবে না। উইলসনকে সে-কথা জানানো হয়েছিল, এবং উইলসন নাকি তাতে সবিশেষ আপত্তি করেনি। অতঃপর, গতকল্য রাত্রে, স্পেশাল ট্রেনের প্রতিটি মানুষই যখন নিদ্রিত, ট্রেন থেকে উইলসনকে তখন আবার কাপতাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং বিবাহ-পর্বটাও নির্বিঘ্নে চুকে গিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

জনৈক সাংবাদিক বললেন, "না না, সকলে তখন ঘুমোচ্ছিল না। আমি জেগে ছিলাম। উইলসনকে অবশ্য আমি অপহৃত হতে দেখিনি। তবে, যদ্দুর মনে পড়ছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমি একজন চাকমা রমণীকে দেখেছি। খুব সম্ভব, উইলসনের শাশুড়ী। ওঃ, মশাই, সে এক হরিব্‌ল্ চেহারা। আমি আশা করব, মেয়ের চেহারা ঠিক মায়ের মত হবে না।"

কে একজন বললেন, "দেব নাকি একটা বক্স-আইটেম পাঠিয়ে?"

শুনে তাঁর পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, "আরে, মশাই, রাখুন আপনার বক্স-আইটেম! কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ! আপনারা ত খুব শাশুড়ীর চেহারার ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন

এদিকে, ব্যাপারটা যে এখন কদ্দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে, তা একবার ভেবে দেখেছেন কেউ? আমি বিস্মিত হব না, যদি দেখি যে, এই নিয়ে একটা ডিপ্লোম্যাটিক ঝঞ্ঝাট বেধে গিয়েছে।"

আর-একজন বললেন, "তা-ই ত। সেটা ত কেউ ভেবে দেখেনি।

পুব বাংলার এক সাংবাদিক বললেন, "ভেবে দেখেননি আর-একটা ব্যাপারও। চাকমাদের হচ্ছে ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি। উইলসনকে, অতএব, যাবজ্জীবন তার শ্বশুরবাড়িতেই, আই মীন শাশুড়ী-বাড়িতেই, থাকতে হবে।"

সেটা অবশ্য এমন-কিছু দুর্ভাবনার ব্যাপার নয়। উইলসনের পক্ষে ত নয়ই। শাশুড়ী-বাড়িতে থাকলে তার, আর কিছু না হক, পাঁচ-পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেমপত্ররচনার পরিশ্রমটা অন্তত বেঁচে যাবে।

প্রাতরাশ-পর্ব তখনও সমাধা হয়নি। মতিন এসে বলল, "দাদা, আপনি চাটগাঁর সমুদ্দুর দেখবেন বলছিলেন না? দেখবেন ত চলুন।"

লোভনীয় প্রস্তাব। উইলসন-প্রসঙ্গ মুলতুবী রেখে, অতএব, নীচে নেমে এলাম।

স্টেশন থেকে বন্দর! বন্দর থেকে সমুদ্রতীর। নদীর ধারেই টানা, দীর্ঘ রাস্তা; এবং সেই রাস্তা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে, আমাদের একেবারে চোখের সুমুখেই কর্ণফুলির বুকটা ধীরে-ধীরে চওড়া হয়ে যাচ্ছে। তারপর, ওপারের দৃশ্য যে কখন দিগ্বলয় হয়ে গেল, এবং নদী যে কখন সমুদ্র হয়ে গেল, আমি টের পাইনি।

অমিতাভ বলল, "নামো।"

বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। বালি, আর বালি। তারপর সমুদ্র। শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। তার বুকের উপরে, ইতস্তত, কয়েকটি নৌকো। পালতোলা শাম্পান।

দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, জলের কাছে কারা দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম, তারা আমাদেরই লোক। বার্নহাইম, কহ্লন, সত্যেন, আর···

চমকে উঠলাম। সত্যেনের পাশে ও কে? উইলসন না?

উইলসনই।

কিন্তু উইলসন এখানে এল কী করে? তার ত এখন চাকমা-গাঁয়ে থাকবার কথা। তাহলে? একই মানুষের পক্ষে, একই সময়ে, ত দু জায়গায় থাকা সম্ভব নয়। তাহলে?

চুপি-চুপি বললাম, "অমিতাভ, আমি ভূত দেখছি না ত?"

অমিতাভ বলল, "অনিল, আমি কি উইলসনকে দেখছি?"

অনিল বলল, "বিলক্ষণ। বেশ বুঝতে পারছি, বিশুদ্ধ একটি গুজব রটানো হয়েছে। এবং এইজন্যেই সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, গুজবে কান দেবেন না।"

* * *

সমুদ্র-দর্শনের পর স্টেশনে ফিরলাম আমরা। এবং মধ্যাহ্ন-ভোজ চুকিয়ে, দুপুর আড়াইটে নাগাদ, গবর্নমেণ্ট-হাউসে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে ছিল প্রশ্নোত্তর-সভা। লাটভবনের প্রাঙ্গণে, মস্ত চাঁদোয়া খাটিয়ে, তার আয়োজন করা হয়েছিল।

সভায় সেদিন প্রশ্ন নেহাত কম ওঠেনি। প্রশ্ন উঠেছিল নানা বিষয়ে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তার অন্যতম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, বহুবিতর্কিত এই বিষয়টির প্রতি সমর্থন জানিয়ে যিনি সেদিন দু-চার কথা বললেন, তিনি যুবক নন, তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন, তিনি একজন দীর্ঘশ্মশ্রু মৌলবী। অতি স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানালেন যে, অবস্থা এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে, তাতে দুটির বেশী সন্তান হবার কোনও অর্থ হয় না। "আমি আর আমার বিবি, দুজনে এই পৃথিবীতে

এসেছি, দুদিনের জন্যে একটা সংসার সাজিয়ে বসেছি। যখন চলে যাব, সেই সংসারে মাত্র দুজনকেই তখন রেখে যাব। ঠিক কিনা?”

আয়ুব বললেন, বিলক্ষণ।

প্রশ্ন উঠল ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে। আয়ুব জানালেন, পাকিস্তানের প্রতিটি শিশুই যাতে ইসলামী শিক্ষা পায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

উক্তিটা অস্বস্তিকর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করা ভাল যে, আয়ুবের এই উক্তি সেদিন সাংবাদিকদের চিত্তে বিশেষ বিস্ময়ের সঞ্চার করেনি। তার কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-ভাষণেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাঁর এই আগ্রহের একটা আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তবু প্রশ্ন জাগছিল, পাকিস্তানের নাগরিক বলতে আয়ুব কি শুধু মুসলমানদেরই বোঝেন? যে আশি লক্ষ অমুসলমান এখনও পাকিস্তানে রয়েছে, আয়ুব কি তাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি? নাকি তাদের সন্তানদেরও এই ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে? হবে কিনা, জানিনে। এইটুকুমাত্র জানি যে, আয়ুবের এই উক্তি হয়ত পাকিস্তানের অমুসলমান নাগরিকদের ঈষৎ বিচলিত করতে পারে।

প্রশ্ন উঠেছিল বেসিক ডিমোক্রেসি সম্পর্কেও। “মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার, মনোনয়ন-প্রথায় গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে থাকে। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মধ্যে তবু মনোনয়নের ব্যবস্থা এত ঢালাও কেন? গণতন্ত্রের চরিত্র কি এতে ক্ষুণ্ণ হবে না।”

প্রশ্নকর্তার বয়স খুবই অল্প। বড়জোর তিরিশ। আয়ুব তাকে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন, “ইট্'স ফ্যাশনেব্‌ল টু হ্যাভ দি কাইণ্ড অব ডিমোক্রেসি য়ু আর টকিং অ্যাবাউট। কিন্তু তার পরিণাম যে কত ক্ষতিকর হতে পারে, আগের আমলেই তা তোমরা দেখেছ। গণতন্ত্রের নামে বল্গা-ছেঁড়া সেই মত্ততাকে আমি আর ফিরিয়ে আনতে চাইনে। ফিরিয়ে আমি আনব না।”

আয়ুবের কথায় কি কোনও যুক্তি ছিল না? অবশ্যই ছিল। পক্ষান্তরে, তাঁর যুক্তির উত্তরে আবার পাল্টা-যুক্তিও এগিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু, পাকিস্তানে আজ কে তা দেবে? সুরাবর্দী? চুন্দ্রীগড়? ফিরোজ খাঁ নুন? হায়, গণতন্ত্রের মর্যাদা যারা রাখেনি, গণতন্ত্রের সপক্ষে আজ আর কী বলবে তারা?

কেউই কিছু বলল না।

চট্টগ্রাম ছাড়লাম বিকেল পাঁচটায়। সমুদ্রের কাছেই পতঙ্গা এয়ারপোর্ট। পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের দুটি ডাকোটা বিমান সেখানে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। প্লেনে উঠলাম এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তেজগাঁওয়ে এসে পৌঁছলাম। তেজগাঁও থেকে নারায়ণগঞ্জ, টানা রাস্তা। নারায়ণগঞ্জে এসে স্টীমারে উঠেছিলাম। মাল্লা, কুলি আর জেটির জনতার চিৎকারে তখন কান পাতা যাচ্ছিল না। সেই কোলাহল ক্রমে শান্ত হয়ে এল। তখন শুনতে পেলাম যে, জলকল্লোল জেগে উঠেছে। ছল্‌ছল্, ছল্‌ছল্, ছল্‌ছল্। অন্ধকারে অদৃশ্য নদীর সেই রহস্যময় শব্দতরঙ্গ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তারপর সকাল হল, সূর্য উঠল, যাত্রীদের ঘুম ভাঙল। কেবিন থেকে, একে একে, সবাই ডেক্-এ এসে জমায়েত হলেন। কিন্তু ভোর ছটাতেই যেখানে পৌঁছবার কথা, সেই গোয়ালন্দের তবু দেখা পাওয়া গেল না। এদিকে স্টীমারও ততক্ষণে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। কেন ? খবর নিয়ে জানলাম, শেষরাত্রে চড়ায় ঠেকে গিয়েছি। এখন উপায় ? লঞ্চে উঠতে হবে। খবর পাঠানো হয়েছে ; লঞ্চ হয়তো আর একটু বাদেই এসে পৌঁছে যাবে।

লঞ্চ এল, এবং স্টীমার থেকে আমরা লঞ্চে গিয়ে উঠলাম। তবে তাতেও বিশেষ লাভ হল না। আবার চড়া। একটার পর একটা চড়ায় ঠেকতে ঠেকতে, এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জলযানে উঠতে উঠতে যে শেষ পর্যন্ত কীভাবে আমরা গোয়ালন্দে গিয়ে পৌঁছলাম, তার সবিস্তার বর্ণনা আর দেব না। পাঠক শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে, গোয়ালন্দঘাটে পৌঁছতে সেদিন আমাদের ঝাড়া চার ঘণ্টা লেট হয়ে

গিয়েছিল। পাড়ে নেমে, ব্রড গেজের ট্রেনে উঠে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাড়ে দশটা।

গোয়ালন্দ থেকে পাঁচুরিয়া জংশন। পাঁচুরিয়া থেকে ফরিদপুর। এ আমার চেনা পথ। এক যুগ এদিকে আসিনি। কিন্তু তার আগে এত অসংখ্যবার এসেছি যে, এ-পথের স্টেশনগুলির নামাবলী আমি মুখস্থ বলতে পারি; প্রতিটি স্টেশনের নিখুঁত একটি বর্ণনা দেওয়াও আমার পক্ষে শক্ত নয়।

কহ্লন বলল, "বর্ণনা দিতে হবে না। শুধু নামাবলী মুখস্থ বলে যাও। ঠিক-ঠিক বলতে পার ত প্রাইজ হিসেবে একটি সিগারেট পাবে।"

প্রাইজ কিন্তু পাইনি। তার কারণ, শিবরামপুর স্টেশনের নাম যে ইতিমধ্যে পালটে গিয়েছে, তা আমার জানা ছিল না। শিবরামপুরের নাম হয়েছে আমিরাবাদ।

একে ত পুরস্কার হারাবার দুঃখ ছিল, তার উপরে আবার এই নতুন নামকরণের আঘাতটাও আমার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয়নি। বুঝতে পারছিলাম যে, এ শুধু নাম পালটাবার ঝোঁকে নাম পালটানো নয়, এর একটা অন্য রকমের তাৎপর্য রয়েছে। এবং সেই তাৎপর্য সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তুলতে গেলে হয়ত জল ঘুলিয়ে উঠবে। ভাবতে গিয়ে বড় বিশ্রী লাগছিল আমার।

কহ্লন সেটা অনুমান করে থাকবে। বলল, এতে এত বিস্মিত হচ্ছ কেন? নারায়ণগঞ্জকে যে এখন নূরহানগঞ্জ বলা হয়, তা তুমি জানতে না?"

বললাম, "জানি। তবু বিশ্রী লাগে। ভারী বিশ্রী লাগে।"

মস্ত সভা হল ফরিদপুরে। শহর থেকে, গ্রাম থেকে, বিস্তর লোক সেই সভায় এসে জড় হয়েছিল। কত লোক? একজন বললেন, কুড়ি হাজার। আর-একজন তার প্রতিবাদ করে বললেন, না, তিরিশ হাজারের কম নয়। সত্যি বলতে কী, অঙ্কটা যেখানে হাজারের, কুড়ি আর তিরিশের পার্থক্য আমি সেখানে ধরতে পারিনে। অনেকে পারেন। কী করে যে পারেন, সেইটেই এক আশ্চর্য ব্যাপার!

সামরিক আইন চালু থাকবে কিনা, ফরিদপুরের সভায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। আয়ুব বললেন, "হোয়াই নট? মার্শাল ল ত আপনাদের কোনও ক্ষতি করেনি। বরং অনেক উপকার করেছে। মার্শাল ল না থাকলে কি কালোবাজারীরা জব্দ হত? ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার হত? এ নিয়ে কোনও আপত্তির তাই অর্থ নেই।"

প্রশ্ন উঠেছিল বুনিয়াদী গণতন্ত্র সম্পর্কে। বুনিয়াদী গণতন্ত্রে কি পার্টি-প্রথার স্থান থাকবে? আয়ুব এ-প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন যে, রাজনৈতিক পার্টিগুলি ইতিপূর্বে পাকিস্তানের অনেক ক্ষতি করেছে। তারপর, একটু নীরব থেকে আবার বললেন, "ভার ীয় নেতা জয়প্রকাশের কথা আমি বলতে পারি। রাজনৈতিক পার্টিতে তাঁরও কোনও আস্থা নেই।"

ফরিদপুর থেকে কুষ্টিয়া, তিন ঘণ্টার পথ। সেই তিন ঘণ্টা যেন আর কাটতে চাইছিল না। তার একটা কারণ এই যে, ট্রেন-ভ্রমণের যা-কিছু আনন্দ, চট্টগ্রামেই তার অবসান হয়েছিল। এটিও স্পেশ্যাল ট্রেন, কিন্তু অবস্থা এর জরাজীর্ণ, এবং সর্বাঙ্গ এর ধূলিধূসর। জানলায় ধুলো আয়নায় ধুলো, গদিতে ধুলো। কামরাগুলি সেকেলে। দরজা সহজে বন্ধ হতে চায় না, এবং জানলা খুলতে মালকোছা আঁটতে হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের এক সাংবাদিক বললেন, "আমার বিশ্বাস, ইংরেজী আমলের অনেক আগেই এ-দেশে রেলগাড়ি ছিল।"

"বিশ্বাসের হেতু?"

"হেতু এই স্পেশ্যাল ট্রেন। যদি শুনি যে ময়নামতী এক্সক্যাভেশনের সময় মাটির তলা থেকে এটিকে উদ্ধার করা হয়েছে, আমি বিস্মিত হব না।"

কুষ্টিয়া জায়গাটি নেহাত কৃষিনির্ভর নয়; অল্প-কিছু শিল্পসম্পদও তার আছে। আছে কাপড়-কল, আছে চিনির কারখানা। তাকে কেন্দ্র করে মোটামুটি সচ্ছল একটি জীবন-ব্যবস্থাও এখানে গড়ে উঠেছে। শহরের ঘরবাড়ি আর মানুষজনকে দেখেই তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

স্টেশন থেকে অল্প একটু দূরেই সেদিন সভার আয়োজন করা হয়েছিল। মস্ত সভা। তবে যে-সব প্রশ্ন তোলা হল সেখানে, তার অধিকাংশই বিশেষ জরুরী নয়। ফাঁপানো-চুল রঞ্জিত-ঠোঁট এক তরুণী সেখানে পরিবার-পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তান-সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কিনা।

আয়ুব বললেন, "অবশ্য। চট্টগ্রামেও এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। প্রশ্নকর্তা বলেছিলেন, তুটির বেশী সন্তান হওয়া উচিত নয়। সন্তান ঠিক কটি হবে, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে। আমি শুধু বলতে চাই যে, জনসংখ্যাকে এখন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।"

একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। জনজীবনের যেগুলি সবচাইতে জরুরী সমস্যা, নিত্যদিনের সমস্যা, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠছে না কেন। যদি-বা উঠছে, এত ধোঁয়াটেভাবে উঠছে কেন।

চালের মণ যেখানে ন্যূনপক্ষে পঁয়ত্রিশ টাকা এবং মিলের মোটা কাপড়ের জোড়া যেখানে পনর থেকে পঁচিশ (তাঁতবস্ত্রের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, একজোড়া তাঁতের কাপড় কিনতে অন্তত পঁয়ত্রিশ টাকার ধাক্কা), অন্নবস্ত্রের অভাবের কথাটা সেখানে অনুক্ত থাকছে কেন। ঢাকা, কুমিল্লা, ফেনি, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, এই ক'দিনে ত কম জায়গায় ঘুরলাম না। কিন্তু একটা জায়গাতেও কোনও খেটে-খাওয়া মানুষের মুখে এই স্পষ্ট প্রশ্নটা কেন শোনা গেল না যে, হুজুর, আমরা গণতন্ত্রের কথাও বুঝিনে, কমনওয়েলথ-সম্মেলনের কথাও বুঝিনে, আমাদের অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা করে দিন; এমন একটা ব্যবস্থা করে দিন, ছেলেপুলে নিয়ে যাতে আমাদের পথে বসতে না হয়।

আয়ুবকে দোষ দেব না। তার কারণ, স্পষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হতে যে তাঁর আপত্তি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ আমি পাইনি। পক্ষান্তরে, আমার ধারণা, এই জরুরী প্রশ্নগুলিই তিনি হয়ত শুনতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য প্রশ্ন ত তিনি পিণ্ডিতে বসেই শুনতে পেতেন; তার জন্যে তিনি জনজীবনের মধ্যে ছুটে আসবেন কেন, জনতার মধ্যে এসে দাঁড়াতে চাইবেন কেন। আয়ুব ছুটে এসেছেন; জনজীবনের সমস্যাগুলিকে তিনি জানতে চাইছেন; তবু কেন সেই মৌলিক সমস্যার একটা স্পষ্ট চিত্র তাঁর চোখের সামনে এনে তুলে ধরা হচ্ছে না? তবু কেন তাঁর জনসভায় শুধু নীতিগত কতকগুলি প্রশ্ন তোলা হচ্ছে?—অন্নবস্ত্র আর তেল-নুন-লকড়ির প্রশ্নগুলিকে চেপে রেখে?

এর মধ্যে কি অফিশল্‌ডমের হাত আছে নাকি? আয়ুব পাছে বিরক্ত হন, সেই আশঙ্কায় কি জনজীবনের প্রকৃত সমস্যার কথা তাঁকে তাঁরা জানতে দিচ্ছেন না?

উত্তরটা পার্বতীপুরে পাওয়া গেল। আয়ুবকে সেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছিল, এবং স্মিতহাস্যে আয়ুব তার জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু পরিবেশের

সেই নিস্তরঙ্গ শান্তি হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। দেখতে পাওয়া গেল, ভিড়ের মধ্যে থেকে দীর্ঘ একটি মানুষ অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে উঠেছে, এবং ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

কী ব্যাপার?

"আমার একটা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সেই প্রশ্নটা এঁরা তুলতে দেননি।"

এঁরা মানে অফিশল্‌ডম!

অফিশল্‌ডমের বজ্র-আঁটুনির আরও একটি প্রমাণ সেদিন পেয়েছিলাম। মিটিং তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই সময়ে একটা কোলাহল উঠল হঠাৎ। কী ব্যাপার? না, নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে কে একজন যেন ছুটে আসছিল এদিকে। প্রহরীরা তাকে আটকে দিয়েছে। সার্চও করা হয়েছে, তবে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, তালিমারা-জামা-গায়ে রোগা একটা মানুষ, সেপাই-শান্ত্রাদের ধমক খেয়ে সে শুধু হাপুস নয়নে কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, "আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করব।"

ব্রিগেডিয়ার এফ. আর. খাঁ-ও এগিয়ে এসেছিলেন। সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি। দৃঢ় গলায় বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও তোমরা।"

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাও তুমি?"

লোকটার সেই এক কথা। "আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করব। তাঁর কাছে আমার নালিশ আছে।"

ব্রিগেডিয়ারই দেখা করিয়ে দিলেন। সব শুনে জিজ্ঞেস করলেন আয়ুব, "ব্যাপার কী? কিসের নালিশ?"

"হুজুর, আমি বিড়ি বাঁধি। কিন্তু দিনের মধ্যে ষোল থেকে কুড়ি ঘণ্টা খেটেও আমি সাত সিকের বেশী মজুরি পাই না। হুজুর, এই আয়ে আমার সংসার চলে না।"

বলতে বলতেই লোকটা আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

এস. ডি. ও. সাহেব একেবারে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে আয়ুব জিজ্ঞেস করলেন, "এ কি সত্যি ?"

ঘাড় চুলকে এস. ডি. ও. বললেন, সত্যি। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। কয়েকটা ক্ষেত্রে।

"সেই কয়েকটা ক্ষেত্রের তবে খবর নিন। খবর নিয়ে এর একটা বিহিত করুন। এবং অবিলম্বে করুন।"

নির্দেশ দিয়ে আয়ুব আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

ট্রেন আবার পিছু হটছে। পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সফর আমাদের শেষ হল। এবারে প্রত্যাবর্তনের পালা।

জানলায় মুখ রেখে ভাবছিলাম যে, আমার অনুমান তাহলে ভিত্তি-হীন নয়। জনতা তাহলে আয়ুবের কাছে তাদের আটপৌরে অভাব-অভিযোগের কথাই তুলতে চেয়েছিল। তোলা সম্ভব হয়নি। সেই আটপৌরে প্রশ্নগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রেসিডেণ্টের সামনে শুধু পোশাকী কয়েকটা প্রশ্নকেই এরা এগিয়ে দিয়েছে। এরা মানে এই অতি-উৎসাহী আমলারা, আম-জনতাকে শুধু দূরে ঠেলতেই যারা অভ্যস্ত।

দোষ আয়ুবের নয়। দোষ আমলাদের। লোকসানটা কিন্তু আয়ুবেরই হল। জনজীবনের হৃৎস্পন্দন তিনি শুনতে চেয়েছিলেন। শুনতে পেলেন না।

রেল-লাইন এখানে ভারতীয় সীমান্তের একেবারে গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। লাইনের ধারে কাঁটাতারের বেড়া, তার ওদিকে ভারতবর্ষ। আমার স্বদেশ। ট্রেনের থেকেই দেখতে পেলাম, লাইনের ওদিকে পতাকা উড়ছে। তেরঙ্গা পতাকা।

আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি।

"আমার নাম ফজলুর রহমান খাঁ। রাজপুত-বংশে আমার জন্ম। আমার বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ। আপনি কি কখনও নাভায় গিয়েছেন? যাননি? তবে ত বাদবারকেও আপনি চিনবেন না। নাভার বাদবার গ্রামে, ১৯১৪ সালে, আমি জন্মেছিলাম। বাল্যশিক্ষা নাভায়। পরে, ১৯৩৭ সালে, পাতিয়ালার মহেন্দ্র কলেজ থেকে আমি বি. এ. পাশ করি। আমার বয়স তখন তেইশ। তার তিন বছর বাদে আমি আর্মিতে নাম লেখাই। বিশ্ব জুড়ে তখন যুদ্ধ চলছে। হ্যাঁ, আমার গায়েও তার কিছু আঁচ লেগেছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫, এই ক'বছর আমি সাইপ্রাসে আর ইতালিতে ছিলাম। টেন্থ ইণ্ডিয়ান ডিভিশনের সৈনিক হিসেবে তখন আমাকে লড়াই করতে হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ সালের নবেম্বরে আমি দেশে ফিরি। তার দু বছর বাদে পাকিস্তান হল: আমি পাকিস্তানে চলে এলাম। অক্টোবর-বিপ্লবের পরে আমাকে নতুন কাজ দেওয়া হয়েছে। এখন আমি ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন ব্যুরোর ডিরেক্টর। জীবন কাটিয়েছি খাকি পোশাকে। আঁটসাট খাকি পোশাকেই আমি অভ্যস্ত। তা এই নতুন পোশাকও কিছু খারাপ লাগছে না।"

একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন ব্রিগেডিয়ার এফ. আর. খাঁ। তারপর বললেন, "আর কিছু জানতে চান?"

বললাম, "না, ধন্যবাদ। এতেই হবে।"

"ওয়েল, স্যার, ইট'স মাই টার্ন নাউ। কয়েকটা প্রশ্ন করি আপনাকে?"

"করুন।"

"আমাদের প্রেসিডেন্টকে আপনার কেমন লাগল?"

"খারাপ কেন লাগবে ?"

"আমাদের দেশকে ?"

আবার সেই অস্বস্তিকর প্রশ্ন। পদ্মার উপর দিয়ে স্টীমার চলেছে। এঞ্জিনের একটানা, একঘেয়ে শব্দ ঃ ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্। সামনের ডেক-এর উপরে বসে আছি আমরা। আমি, কহ্লন আর ব্রিগেডিয়ার। নদীর জোলো হাওয়ায় যেন হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। সার্চলাইটের আলো পড়েছে সামনে। জলের উপরে লুণ্ঠিত সেই আলোকরশ্মিকে যেন চওড়া একটা পথের মতন দেখাচ্ছে। দু দিকের অন্ধকার থেকে জেলে-ডিঙিগুলি সেই পথের উপর এসে ছিটকে পড়ছে এবং পরক্ষণেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। তটভূমি অন্ধকার। গ্রামগুলি ঘুমিয়ে আছে। স্টীমারের ভরাট, গম্ভীর হুইশ্‌ল শুনে কোনও গ্রামবাসী তার ঘুম থেকে হয়ত জেগে উঠবে। অকারণে তার মনটা একবার উদাস হয়ে যাবে হয়ত। সেই উদাস বিষণ্ণতার সে কোনও কারণ খুঁজে পাবে না। বিছানা থেকে উঠে, পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে, সে যখন আবার শুতে যাবে, তার বিষণ্ণতা তখনও কাটেনি। শুয়ে শুয়েই সে ভাবতে থাকবে, কেন, কেন, আমার মনটা এমন উদাস হয়ে গেল কেন। কোনও উত্তরই সে পাবে না। তখন, মস্ত বড় একটা অস্বস্তিকে তার বুকের মধ্যে চেপে রেখেই, সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

ব্রিগেডিয়ার বললেন, "আমার প্রশ্নের এখনও উত্তর পাইনি।"

বললাম, "আপনাদের দেশ আমার কেমন লাগছে, এই ত ? ভাল লাগছে।"

"লাগবারই কথা। দেশ আমাদের সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষগুলি আরও অনেক বেশী সুন্দর। এদের উদ্যম, এদের উদ্দীপনা, এদের কর্মশক্তির কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু, দুঃখের ব্যাপার, সেই শক্তিকে আজও কাজে লাগানো যায়নি। লাগাতে পারলে অসাধ্য-

সাধন করা যেত। আপনি ভাবতে পারেন, আমি বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আমার এই কথার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। প্রাণোচ্ছল, সৎ, সাহসী, কর্মঠ এই মানুষগুলি, এদের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আপনি খুশী হতেন।"

বললাম, "পরিচয় যে একেবারে নেই, তা নয়।"

ব্রিগেডিয়ার বললেন, "আমার কথাগুলিকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। ওয়ান হ্যাজ টু নো দিস কান্ট্রি টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হোয়ট আই মীন।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ব্রিগেডিয়ার। তারপর, কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অন্তরঙ্গতার মিশ্রণ ঘটিয়ে, বললেন, "বাই দি ওয়ে, আপনার জন্ম কি পূর্ববঙ্গে?"

বললাম, "হ্যাঁ। আজ থেকে এক যুগ আগে এই পূর্ববঙ্গেরই এক গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল, এবং অল্প-কিছু জমিজমা ছিল।"

"তা এই সূত্রে সেই গ্রামটিকেও কেন একবার দেখে যাচ্ছেন না আপনি? বলেন ত আমরা ব্যবস্থা করে দিই। কোনো অসুবিধেই আপনার হবে না। যাবেন?"

বললাম, "কী হবে গিয়ে। গিয়ে হয়ত দেখব, আমার পিতৃপুরুষের ভিটের উপর এখন পাটের চাষ হচ্ছে। একটা তবু স্মৃতিকে নিয়ে এখনও বেঁচে আছি। সেই স্মৃতিটা সুদ্ধ ভেঙে যাবে।"

ব্রিগেডিয়ার বললেন, "সো!"

চুপ করে বসে রইলাম আমরা। নদীর উপরে আলো পড়েছে। গ্রামগুলি অন্ধকার। এঞ্জিনের একটানা শব্দ: ঝক্‌ঝক্, ঝক্‌ঝক্, ঝক্-ঝক্। হাওয়া বইছে। পদ্মার জোলো, ঠাণ্ডা হাওয়া।

ব্রিগেডিয়ার বললেন, "অনেক রাত হল। চলুন, শুয়ে পড়া যাক।"

সাতাশে জানুয়ারী সকালে আমরা ঢাকায় ফিরলাম।

সকালেই দুটি অনুষ্ঠান ছিল। ক্যাণ্টনমেণ্ট স্কুলে আর ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্‌স্টিট্যুটে।

এয়ারপোর্টের পথে শহর ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, ডানদিকে মোড় ফিরলেই ক্যাণ্টনমেণ্ট স্কুল। সদ্য-সমাপ্ত মস্ত বড় বাড়ি। আয়ুব তার দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। কথাপ্রসঙ্গে শিল্পপতি আদমজীকে বিস্তর ধন্যবাদ দিলেন তিনি। দেবার কারণ ছিল। আদমজী এর জন্য টাকা জুগিয়েছেন। (কোন্‌টার জন্যই বা জোগাননি! টাকা মানেই আদমজী, এবং আদমজী মানেই টাকা। যেখানেই হোক, যে-ব্যাপারেই হোক, ডোনর্স-লিস্টের একেবারে শীর্ষস্থানেই তাঁর নাম দেখা যাবে।) ধন্যবাদ দেওয়া হল ব্রিটিশ কাউন্সিলকেও। তা-ও অকারণ নয়। ব্রিটিশ কাউন্সিল নাকি এই সামরিক শিক্ষায়তনকে কিছু বইপত্র দিয়েছেন; এবং আশা দিয়েছেন, অনতিকালের মধ্যেই তাঁরা এর জন্য একটি সাহেব-প্রিন্সিপাল সংগ্রহ করে দেবেন।

ক্যাণ্টনমেণ্ট স্কুল থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্‌স্টিট্যুট হল। পৌছতে প্রায় মিনিট পঁচিশেক লাগল। বছর খানেক আগেও এ-হলের অন্য নাম ছিল। 'ইঞ্জিনীয়ারিং ইন্‌স্টিট্যুট হল্' বললে তখন কেউ চিনতে পারত না। বলতে হত 'ইস্কান্দর হল্'। চাকা এখন পালটে গিয়েছে। এখন যদি কেউ 'ইস্কান্দর হল্'-এর নিশানা জানতে চায়, অনেকেই তাহলে বিস্মিত হবার ভান করবে।

ইন্‌স্টিট্যুট হল্-এর জনসভায় সেদিন অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সবাই বিচলিত, বিভ্রান্ত হয়েছেন।

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার্, মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য কার্যকর কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে?"

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার্, চাল-ডাল্-তেল-নুন-কাপড়-জামার দাম আর আমাদের ক্রয়-ক্ষমতার সীমার মধ্যে নেই। এর কি কোনও বিহিত হবে না?"

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার্, ঢাকা শহরে একটা বাড়ি জোটানো প্রায় অসাধ্য কাজ। যদি-বা জোটানো যায়, তার ভাড়ার অঙ্ক শুনলে আর কারও মাথা ঠিক থাকে না। নতুন যে-সব বাড়ি উঠছে, ডিপ্লোমাটিক সার্বিসের লোকেরাই তা নিয়ে নিচ্ছেন। আমরা তাহলে মাথা গুঁজব কোথায়?"

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার্, মার্শাল ল জারী হবার পর জিনিসপত্রের দাম একটু কমেছিল; কিন্তু এখন আবার ভীষণ রকমের বেড়ে গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, আগের আমলের সঙ্গে তুলনা করলে হয়ত দেখা যাবে যে, এখনকার দাম তখনকার চাইতেও বেশী। দাম কি কমবে না?"

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জীবন-সমস্যার প্রশ্নমালা। ক্রমেই যা আরও তীব্র, আরও দুর্বহ হয়ে উঠছে।

সেই উত্তুঙ্গ, উন্মথিত প্রশ্নমালার সামনে দাঁড়িয়ে আয়ুব সেদিন ঈষৎ বিচলিত হয়েছিলেন কি না, আমার জানা নেই। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মার্শাল ল-য়ের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা হয়ত অভ্রভেদী ছিল। জনসাধারণ হয়ত ধরে নিয়েছিল যে, সামরিক আইনই সেই প্যানাসিয়া, সর্বরোগের যাতে উপশম হবে। মার্শাল ল যখন আছে, তখন দুর্নীতি বন্ধ হবে। মার্শাল ল যখন আছে, তখন রাজনীতি নিষ্কলুষ হবে। মার্শাল ল যখন আছে, তখন, হ্যাঁ, চাল-ডাল-তেল-নুন-লকড়ির দাম আর ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়াও তখন কমবে বই কি!

দুর্নীতি হয়ত হ্রাস পেয়েছে; রাজনীতি শুধু নিষ্কলুষ নয়, নির্মূল হয়েছে; কিন্তু পণ্যমূল্য এখনও কমেনি। একবারই মাত্র কমেছিল,

কিন্তু তার পরক্ষণেই আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে, তার কারণ, মার্শাল ল সত্যিই প্যানাসিয়া নয়। অর্থনীতির কতকগুলি মৌল নিয়মকে সে উল্‌টে দিতে পারে না।

আয়ুব বুঝতে পেরেছিলেন, সেই সহজ কথাটাকেই এবার জানিয়ে দেওয়া দরকার। জানিয়ে তিনি দিলেনও। বললেন, "মার্শাল ল জারী হবার পর জিনিসপত্রের দাম যে অনেক পড়ে গিয়েছিল, তা আমি জানি। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-ও আমি জানি যে, ভয় পেয়ে গিয়ে অনেকেই তখন ন্যায্য দামের চাইতেও কম দাম নিয়েছে। ইউ জাস্ট কাণ্ট টেক দোজ প্রাইসেস অ্যাজ রিয়েল অর ইকনমিক প্রাইসেস। দাম যদি কমাতে হয়, উৎপাদন বাড়াতে হবে। স্থায়ী ভাবে দাম কমাবার এ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

মার্শাল ল যে সর্বরোগহর সালসা নয়, জনজীবনের সমস্যার সমাধান যে আসলে জনসাধারণকেই করতে হবে, এই স্বীকারোক্তির সেদিন প্রয়োজন ছিল। আয়ুবকে ধন্যবাদ, সত্যকে স্বীকার করে নিতে তাঁর কুণ্ঠা হয়নি।

মিটিং থেকে বেরিয়ে এসেই শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেনকে ফোন করলাম। শ্রীযুক্ত সেনকে আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। ভারতীয় হাই-কমিশনের তিনি প্রেস-অ্যাটাশে। উৎসাহী, আলাপী মানুষ। কুশল বিনিময়ের পর বললেন, "আজ রাত্রে আমার এখানেই দুটি অন্ন গ্রহণ করুন।"

বললাম, "আজ নয়। আজ আমরা সিলেট যাচ্ছি। কাল বিকেলে ফিরব।"

"তা বেশ ত, কালই আসুন।"

"যাব। তবে নিমন্ত্রণ-গ্রহণের একটা শর্ত আছে।"

"বলুন।"

"পোলাও, কালিয়া, কোফ্‌তা, কোর্মা আর বিরিয়ানি খেতে খেতে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি। দয়া করে যদি দুটি ডালভাতের ব্যবস্থা করেন, কৃতজ্ঞ থাকব। পাতলা মুসুরির ডাল; সম্বরা হবে কালোজিরে-পাঁচফোড়নের। সেই সঙ্গে থাকবে কাঁচালঙ্কা-মাখা আলুসেদ্ধ আর বেগুন ভাজা। রাজী?"

কৈলাসচন্দ্র একেবারে অট্টহাস্য করে উঠলেন। বললেন, "রাজী। কিন্তু মাছ ত করতেই হবে।"

বললাম, "করুন, বাই অল মীন্‌স। কিন্তু ফিশ-ফ্রাই নয়, মাছের ঝোল। কইমাছ খাওয়াবেন?"

"খাওয়াব। বলেন ত ফরিদপুরের হাজারি-পাটালিও খাওয়াতে পারি।"

আনন্দে আমার বাক্‌স্ফূর্তি হচ্ছিল না। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

সাতাশ তারিখে আমাদের কাজ নেহাত কম ছিল না। বিকেল নাগাদ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স কর্পোরেশনের অফিসে গিয়ে জানিয়ে দিলাম যে, তিরিশে সকালের প্লেনে আমরা কলকাতা ফিরব। সেখান থেকে গেলাম শাবাগ হোটেলে। শাবাগ থেকে তার-অফিসে। কলকাতার খবর পাঠিয়ে রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম, ট্রেন ছাড়তে তখন আর মাত্র দু-তিন মিনিট বাকী।

শ্রীহট্টে পৌঁছলাম ভোরবেলায়। উত্তর থেকে হাওয়া দিচ্ছিল তখন, এবং সেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে যচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে নামতেই আলির সঙ্গে দেখা। আলি সিলেটের ছেলে। কিছুদিন লণ্ডনে ছিল। বিলিতী কাগজে হাত পাকিয়ে এখন পাকিস্তান টাইম্‌স্-এ কাজ নিয়েছে। আলি তাদের ঢাকা-করেসপণ্ডেণ্ট। ঢাকার

প্রেস ক্লাবের সে প্রেসিডেন্টও বটে। অথচ, বয়স তার কতই বা। মেরেকেটে তিরিশ। তার বেশী নয়।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, "আলি, এ বড় কোল্ড রিসেপশন হল!"

আলি রসিক ছেলে। একগাল হেসে বলল, "ওয়েল, চাচা, আওয়ার হ্যাণ্ডস আর কোল্ড, বাট আওয়ার হার্ট ইজ ওয়র্ম।"

আলি আমাকে 'চাচা' বলে ডাকত। তার কারণ আর কিছুই নয়, তার আপন চাচা বিখ্যাত লেখক ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলিকে আমি 'দাদা' বলে ডাকি।

শ্রীহট্ট অতি পরিচ্ছন্ন শহর, এবং সুরমা অতি সুন্দরী নদী। শহরটিকে সে যেন অতি মমতাভরে তার স্নেহাঞ্চল দিয়ে ঘিরে রেখেছে। নদী পেরিয়ে টানা দীর্ঘ পথ। পথের দু দিকে চায়ের বাগান, শস্যক্ষেত্র। মনোরম দু-একটি বাড়িও মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। শ্রীহট্ট পার্বত্য ভূমি; পথও তাই সমতল নয়। চড়াইয়ে-উতরাইয়ে ওঠানামা করতে করতে, দু দিকের ঘরবাড়ি আর গাছপালার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে, সে-পথ সামনে এগিয়ে গিয়েছে।

পথের ধারে এয়ারফিল্ড। আয়ুব এ-যাত্রায় ট্রেনে আসেননি। ঢাকা থেকে আকাশপথে তিনি শ্রীহট্টে এলেন। সিকিউরিটি-ব্যবস্থায় এখানেও কোনও ত্রুটি ছিল না। শহর থেকে এয়ারফিল্ড পর্যন্ত, পথের দুধারে, কড়া পাহারা। সেই পাহারার মধ্য দিয়ে, দর্শনার্থীদের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে সভাস্থলে এলেন আয়ুব; মঞ্চে উঠে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আয়ুবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জয়েণ্ট ডিফেন্স প্রস্তাব যদি কার্যকর হয়, পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্য তাতে ক্ষুণ্ণ হবে কিনা। আয়ুব বললেন, না, এমন আশঙ্কার কারণ নেই।

প্রশ্ন করা হয়েছিল জমিদারি বিলোপের ক্ষতিপূরণ নিয়ে। প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলা। ইংরেজী আর উর্দু, দুটি ভাষাতেই তাঁর অসামান্য দখল। কখনও ইংরেজীতে, কখনও উর্দুতে, ধীরে-সুস্থে, এতটুকুও চঞ্চল না হয়ে, তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁর কণ্ঠে যদিও বিনয় ছিল, দাবিতে কোনও শৈথিল্য ছিল না। আয়ুব মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছিলেন তাঁর প্রশ্নের, কিন্তু সারাক্ষণই আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, প্রশ্নকর্ত্রীকে যদি খুশী করতে হয়, তবে আরও স্পষ্ট, আরও একাগ্র উত্তরের প্রয়োজন হবে।

খুশী তিনি হচ্ছিলেন না। আয়ুব যখন জানালেন যে, ক্ষতিপূরণের প্রস্তুতি-পর্বের কাজ এখনও শেষ হয়নি, প্রশ্নকর্ত্রীর শেষ প্রশ্ন তখনও বাকী ছিল।

"মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সার, আপনার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। শুধু বুঝতে পারছিনে এ-ব্যাপারে এত দেরি হবে কেন। ডাক্তার এসে যদি দেখে যে, রোগী ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে, তাতে লাভ কার?"

আয়ুবকে শেষ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত গলায়, প্রায় নিজেকে শুনিয়ে, স্বীকার করতে হল, উত্তরটা তাঁর জানা নেই। "এ অতি সঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু কী যে এর জবাব, আমি জানিনে।"

ভাষার প্রশ্ন উঠল সর্বশেষে। আয়ুব বললেন, বিশেষ কোনো ভাষাকে তিনি প্রাধান্য দিতে চান না। পাকিস্তানের ভাষাগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি একটি সর্বজনীন ভাষা তৈরি করতে চান। "সারি জবান মিলিজুলি কর্ এক জবান বানা চাহিয়ে। উয়ো বাংলা নেহি; উয়ো উর্দু নেহি। উয়ো হ্যায় পাকিস্তানী।"

সভা শেষ হল। সফর সাঙ্গ হল। আজ ঢাকা ফিরব।

বাইশ নম্বর হেয়ার স্ট্রীটের এই বাড়িতে আগে নাকি নুরুল আমিন থাকতেন। এখন এটি গবর্নমেণ্ট গেস্ট-হাউস। পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন এখন কোথায় আছেন, আমি জানিনে। আমি এখন এই গেস্ট-হাউসে আছি। শাবাগের খানসামা এসে বিকেলের চা দিয়ে গিয়েছিল। চা খেয়ে, টুকিটাকি কয়েকটা কাজ সেরে নিয়ে, বারান্দার এই অন্ধকারে এসে বসেছি।

পুরু কার্পেটে মোড়া বারান্দা। সেই বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, শীত-রাত্রির এক-আকাশ বেদনা ক্রমেই আরও ঘন, আরও নিবিড় হয়ে উঠছে। আর সেই বেদনার ভার বুকে নিয়ে পৃথিবীর চোখও যেন নিবে আসছে আস্তে-আস্তে। সামনে হেয়ার স্ট্রীট। চওড়া, পরিচ্ছন্ন, ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা। সেই রাস্তায় এখন লোক নেই। রাস্তার ওদিকে মাঠ। সেই বিশাল মাঠও এখন জনশূন্য। অন্ধকার সেখানে থমথম করছে। মাঠ পেরিয়ে আয়ুব অ্যাভেন্যু।

আয়ুব অ্যাভেন্যু এখনও ঝিমিয়ে পড়েনি। দোকানে-দোকানে কেনাবেচা চলেছে। মানুষ চলেছে, মোটর ছুটছে, রক্তচক্ষু নিয়মের ধমকে একফালি আকাশ এখনও চম্‌কে চম্‌কে উঠছে। কোথায় যেন রেকর্ড বাজছে একটা। "মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।" পূর্ববঙ্গের পরিচিত পল্লীগীতি। মাঠের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে সেই অলৌকিক গানের একটা হৃদয়-ছেঁড়া যন্ত্রণা যেন হেয়ার স্ট্রীটের এই স্বল্পালোক তটভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে।

আয়ুব আজ পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করলেন। তাঁর ভাইকাউণ্ট এতক্ষণে রাওয়লপিণ্ডি পৌঁছে গিয়েছে। কাজ ফুরিয়েছে আমাদের। কাল সকালে আমরা কলকাতায় ফিরব।

অথচ, এই ক'দিনে কী দেখলাম, কী বুঝলাম, সেই সঙ্গত প্রশ্নের একটা উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি।

পূর্ববঙ্গকে কি দেখতে পেলাম? সেই পূর্ববঙ্গকে, গ্রাম-জীবনের মধ্যে গিয়ে যাকে দেখতে হয়? পূর্ববঙ্গকে কি বুঝতে পারলাম? সেই পূর্ববঙ্গকে, গ্রামীণ দুঃখ-সুখ আর আনন্দ-যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে গিয়ে যার প্রাণ-রহস্যের সন্ধান নিতে হয়? না, পূর্ববঙ্গকে আমি দেখিনি, বুঝিনি। অন্তত এমন-কিছু তার দেখতে পাইনি, আগে যা আমার দেখা ছিল না। এমন-কিছু তার জানতে পারিনি, আগে যা আমার জানা ছিল না।

কনডাকটেড ট্যুরের একটা মস্ত অসুবিধেই হল এই। অন্যের চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে; অন্যের মন নিয়ে তোমাকে জানতে হবে। কিংবা, একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, এমন কিছুই তুমি দেখতে পাবে না, তোমার আমন্ত্রণকর্তার চক্ষু যাকে দেখছে না; এমন কিছুই তুমি জানবে না, তোমার আমন্ত্রণকর্তার অনিচ্ছা যাকে আড়াল করে আছে।

আমাদের আমন্ত্রণকর্তারা শুধু শহরে-শহরেই ঘুরে বেড়ালেন। আমরাও তাই শুধু শহরই দেখলাম, গ্রামের পরিচয় পেলাম না। অথচ গ্রাম না-দেখলে কি পূর্ববঙ্গকে দেখা যায়?—জানা যায়?

তাই বলে যে আমার জমার খাতে একেবারে শূন্য, এমনও বলতে পারিনে। আর-কিছু না দেখি, কয়েকটি মানুষকে অন্তত দেখেছি। ভালোয়-মন্দে আলোয়-আঁধারে গড়া কয়েকটি মানুষকে। সহৃদয়, বন্ধুবৎসল, সাধারণ কয়েকটি মানুষকে।

অন্যদিকে দেখেছি সুরাবর্দীকে। দেখেছি চুন্দ্রীগড়কে। দেখেছি আতাউর রহমান খাঁকে। যাঁরা ঠিক সাধারণ মানুষ নন, কিন্তু ভাগ্য-চক্রের আবর্তনে যাঁদের অসাধারণত্বের মহিমাটা আজ ঘুচে গিয়েছে।

দেখেছি ফজলুল হক সাহেবকে। ব্যাঘ্রবিক্রম সেই মানুষটিকে, জিন্নাকে যিনি কেয়ার করতেন না; রাগের মাথায় যিনি বলেছিলেন, "হাজার জওহরলালকে আমি পকেটে পুরতে পারি"; এবং গবর্নর হার্বার্টের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে বাধ্য হয়ে অতঃপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় যিনি ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। সেই হক-সাহেব আজ গলিতনখদন্ত। জীবনের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে পৌঁছেছেন তিনি, এবং চারদিকে তাকিয়ে যেন কোনও-কিছুকেই আর বুঝে উঠতে পারছেন না। একটু মমতা, একটু সহানুভূতির স্পর্শ পেলেই তাঁর চোখ দুটি আজ জলে ভরে ওঠে।

"কেয়া হক-সাব্, সব ঠিক হ্যায় তো?" হাইকোর্টের প্রাঙ্গণে আয়ুবের এই সহৃদয় প্রশ্নেও তাঁর চোখ দুটি সেদিন ছলছল করে উঠেছিল। পাকিস্তানের এই নয়া-জমানাতেও যে তাঁর মতামতের একটা মূল্য থাকতে পারে, হক-সাহেব তা ভাবতে পারেননি।

আর দেখেছি আয়ুব খাঁকে। হিলাল-ই-জুরত, হিলাল-ই-পাকিস্তান ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁকে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যিনি ভাগ্যবিধাতা। তাঁর চিন্তার, তাঁর ইচ্ছার কিছু আভাসও হয়ত পেয়েছি।

কী চান আয়ুব খাঁ? পাকিস্তানকে আবার নতুন করে গড়তে চান। রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের তিনি তাড়িয়েছেন, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারে তিনি হাত দিয়েছেন, জনসাধারণের অন্তত একাংশের চিত্তে তিনি আস্থা জাগাতে পেরেছেন, এবং শাসন-যন্ত্রের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবেরও তিনি অবসান ঘটিয়েছেন। (সামরিক আইন প্রবর্তিত হবার পরে সদ্য-গত সরকারের দুর্বল দ্বিধা-খণ্ডিত নীতিকে স্মরণ করে জনৈক অফিসার নাকি মন্তব্য করেছিলেন, "Thank God it's over. For the first time I feel I can depend on tomorrow.

At least I'll know who's boss.") এ-সবই ভাল কথা। কিন্তু একই সঙ্গে আবার স্বীকার করা ভাল যে, এইটুকু ভালই যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানকে যদি একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে আরও অনেক কিছুই তাঁকে করতে হবে। করা সম্ভব হবে, তাঁর উদ্দেশ্যের সততা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং ফৌজী মানুষ আয়ুব খাঁ যদি হঠাৎ ডিমাগগের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হন।

আয়ুব কি ডিমাগগে পরিণত হবেন? জনসাধারণের সস্তা হাততালিকেই কি সম্বল করবেন তিনি? এমন কোনো প্রমাণ আমি পাইনি, কিন্তু আশঙ্কাটাকে তবু উড়িয়ে দিতে পারিনে। কেননা, আমি দেখেছি যে, লিখিত ভাষণটাকে সরিয়ে দিয়ে তিনি এক্সটেম্পার বক্তৃতা দিতে চেয়েছেন। কেননা, আমি শুনেছি যে, জনসাধারণ যখনই ইংরেজীতে তাঁকে কোনো প্রশ্ন শুধিয়েছে, তিরস্কারের ভঙ্গিতে তিনি বলেছেন, "বাংলামে বোলিয়ে!" কেননা, আমি লক্ষ্য করেছি যে, একাধিক সভায় তিনি বলেছেন, "প্রথমে আমি মুসলমান, তারপরে অন্য কিছু।" এবং এই ধরনের এক-একটা উক্তির পরেই তাঁর জনসভায় একেবারে হাততালির ঝড় বয়ে গিয়েছে।

অথচ, সত্যি বলতে কী, য়ুনিভার্সিটির জনসভায় লিখিত ভাষণ পাঠ করবার বরুদ্ধে কোনো যুক্তি ছিল না। দোভাষীর যেখানে অন্ত ছিল না, যে-কোনো ভাষাতেই সেখানে প্রশ্ন করতে দেওয়া চলত। (বিশেষ করে এইজন্যে যে, আয়ুবের ইংরেজী বক্তৃতার অর্থ ত সেখানে তর্জমা করেই বুঝিয়ে দিতে হয়েছে।) এবং অমুসলমান নাগরিকদের সংখ্যা যেখানে অল্প নয়, প্রেসিডেণ্ট সেখানে এত জোর দিয়ে না-বললেও পারতেন যে, সর্বাগ্রে তিনি মুসলমান, তারপরে অন্যকিছু।

আয়ুব ডিমাগগ হতে চান কি না, আমি জানিনে। কিন্তু সস্তা সুলভ এই ক্ল্যাপট্র্যাপগুলিকে আমি চিনি। জানি যে, গৌণ কয়েকটা

ব্যাপারে এগিয়ে গিয়ে মুখ্য কয়েকটা ব্যাপারে যাঁরা পিছিয়ে যেতে চান, মূল লক্ষ্য থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে যাঁরা অন্যপথে ঘুরিয়ে দিতে চান, এই ক্ল্যাপট্র্যাপগুলিই তাঁদের তূণীরে এক-একটা অস্ত্র হয়ে ওঠে। এবং এই অস্ত্রনিক্ষেপের পরিণাম প্রায়ই শুভ হয় না। কারো পক্ষেই হয় না। না নেতার পক্ষে, না জনতার পক্ষে।

কিন্তু আবার বলছি, উপরে যে কয়েকটি ঘটনার আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলি লক্ষণমাত্র; প্রমাণ নয়। আয়ুব যে তাঁর দেশগঠনের ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে একজন চতুর নেতা হতে চান, জনসাধারণের লক্ষ্যকে যে তিনি মৌল সমস্যার ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চান, এমন কোনো প্রমাণ আমি পাইনি। খুবই সম্ভব যে, রজ্জুতে আমার সর্পভ্রম হয়েছে।

হয়ত তা-ই হবে। কেননা, চাতুর্যের কুখ্যাতি যাঁদের অন্তহীন, পাকিস্তানের সেই প্রাক্তন নেতারা কখনো পাক-ভারত বিরোধ মেটাবার কোনো চেষ্টা করেননি। বিরোধটাকে তাঁরা জিইয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, পাকিস্তানের আভ্যন্তর সমস্যার উপর থেকে, জনতার দৃষ্টি তার ফলে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হবে। শাসন-ক্ষমতাকে হাতে রাখা তার ফলে সহজ হবে। জনতা যখনই তাদের ঘরোয়া সমস্যার সমাধান দাবি করেছে, তাদের দৃষ্টিকে তাই সীমান্তের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে; ভারতীয় 'জুজু'র ভিত্তিহীন ভয় দেখিয়ে তাদের আসল সমস্যাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। (ভুলিয়ে দেওয়া যে সব সময়ে সম্ভব হয়েছে, তা অবশ্য বলতে পারিনে।* সম্ভব হলে কি আর পূর্ববঙ্গের নির্বাচন-রণাঙ্গনে মুসলিম লীগ একেবারে উৎখাত হয়ে যেত?)

আয়ুব সেক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাইছেন। ক্ষমতা পাবার পর প্রথম সুযোগেই তিনি নেহরুর সঙ্গে দেখা করেছেন; বর্ডার

সেট্‌লমেণ্টের ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাতে মনে হয়, পাক-জনতার লক্ষ্যকে তিনি বিভ্রান্ত করতে চান না। আসল সমস্যাকে—ঘরের সমস্যাকে—তিনি মেটাতে চান; নকল সমস্যাকে জিইয়ে রাখবার প্রয়োজন তাঁর নেই।

তা যদি হয়, সুখের কথা। পাকিস্তানের পক্ষে ত বটেই, ভারতবর্ষের পক্ষেও। কেননা, ভারতবর্ষ ত এই সমস্যাকে কোনোদিনই জিইয়ে রাখতে চায়নি। প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহে লিপ্ত থাকা তার স্বভাব নয়। তবে তার প্রতিবেশীর সেই স্বভাব ছিল বটে। প্রতিবেশীর প্রকৃতি যদি আজ পালটে গিয়ে থাকে, ভারত তাতে সুখীই হবে।

আয়ুবের বুনিয়াদী গণতন্ত্র সম্পর্কে অবশ্য আমি খুব আশান্বিত নই। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র? আয়ুব তাঁর এই নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে অবশ্য বলতে পারেন যে, পাকিস্তানে ইতিপূর্বে পূর্ণ-গণতন্ত্রের অমর্যাদা ঘটেছে; আবারও যে ঘটবে না, এমন প্রমাণ নেই। এমন যুক্তি ইস্কান্দর মির্জাও দিয়েছিলেন। অধিকাংশ ভোটারই যেখানে অশিক্ষিত, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে কত কারচুপি যে সেখানে সম্ভব, তার একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ইস্কান্দর একদা বলেছিলেন, "Democracy without education is hypocrisy without limitation." এ-সবই আমি জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এই আশঙ্কার কথাটাও আমি ভুলতে পারিনে যে, নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রই অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত ভণ্ডামির উৎস হয়ে উঠতে পারে। তার চাইতেও বড় কথা, গণতন্ত্রের পক্ষে একটা হাফওয়ে-হাউস হওয়া সম্ভব নয়।

অন্ধকার বারান্দা। বেয়ারা এসে আলো জ্বালিয়ে দিল। বলল, "অনেক রাত হয়েছে, সাব্। শাবাগ থেকে আপনাদের খানা নিয়ে আসি?"

বললাম, "আনো। আর হ্যাঁ, আলোটাকে নিবিয়ে দিয়ে যাও।"

কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত যে সেই সাত-সকালেই তাঁর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে ছুটে আসবেন, তা আমরা ভাবতে পারিনি। সেনগুপ্ত-দম্পতির কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। যে ক'দিন ঢাকায় ছিলাম, নিয়মিতভাবে তাঁরা আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন, কোনো সময়েই যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না করি, সেদিকে নজর রেখেছেন। হাইকমিশনের অন্যান্য কর্মীরাও আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে কোনো ত্রুটি করেননি। এরা ছিলেন, তাই ঢাকার দিনগুলি আরও মনোরম হয়ে উঠেছিল।

প্লেনে উঠবার সময় হল।

সেনগুপ্ত বললেন, "ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন।"

উত্তরে কিছু একটা বলা উচিত ছিল। বলতে পারিনি।

প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম। সেনগুপ্ত-দম্পতি তখনও রুমাল নাড়ছিলেন।